বিশ্ব-রহস্য

স্যর জেমস জিন্‌স প্রণীত

‘দি মিস্‌টিরিয়স ইউনিভার্স্‌’এর অনুবাদ

অনুবাদক

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

সিগনেট প্রেস : কলকাতা ২০

****

অনুবাদকের নিবেদন

শ্রীযুক্তা রেণুকা রায়, বি.এস্-সি (ইক্‌নমিক্স্ : লণ্ডন)

শ্রদ্ধাস্পদাষু

ও

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সি. আই. ই., আই. সি. এস্

শ্রদ্ধাস্পদেষু

স্যর জেমস জিন্‌সের বিখ্যাত বই The Mysterious Universeএর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, এই 'বিশ্ব-রহস্য' বইখানি আপনাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাবিধান এমনি অস্বাভাবিক ও তার আয়োজন এতো অকিঞ্চিৎকর যে সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে শিক্ষার ক্ষীণ আলোক পড়েছে, তার বৃহত্তম অংশ শিক্ষাবিহীন হয়ে মূঢ়তার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই সর্বনেশে শিক্ষাপ্রহসনের অবসান ঘটিয়ে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে স্বাভাবিক ও ব্যাপক শিক্ষাধারায় অভিষিক্ত করে দিয়ে, তাকে আবার সহজ, সুস্থ ও সবল করে তুলতে এক পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছেন আপনারা। শিক্ষার উন্নতিবিধানে আপনাদের সম্মিলিত দান অতুলনীয়; এই মহান কর্মপথে এই ক্ষুদ্র শিক্ষাব্রতীর গভীর শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করুন।

আমার কৈফিয়ৎটা আপনাদের কাছে একটু বড়ো করেই দিচ্ছি, এই অনুবাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তাহলেই হয়তো পরিস্ফুট হবে।

যে-আয়োজন নানা দিক দিয়ে মানুষের চিত্তবিকাশের পূর্ণসহায়তা করে তাকেই বলবো সত্যিকারের শিক্ষা। আমাদের দেশে এই আয়োজনের অতিস্বল্পতায় শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে অস্বাভাবিক, তাই দেশের মাটির সঙ্গে তার ঘটেছে বিচ্ছেদ ; যা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আমাদের আপন হওয়া উচিত ছিল তা রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে, তার সঙ্গে বাইরের যোগসূত্রের একটা আড়ম্বর থাকলেও অন্তরের যোগ ঘটেনি। এই আয়োজনের প্রধান উপকরণ হল 'বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানে-গড়া পাশ্চাত্য বিদ্যা এদেশে মাপাহাতার ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেশনেই পর্যবসিত, তার সেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই সামান্য অভিষিক্ত করেছে, নিচের বৃহত্তর স্তর রয়েছে শুষ্ক মরুময় হয়ে। এই বিদ্যার অভাবে অন্ধসংস্কার, অপবিশ্বাস ও মূঢ়তা আজ অবাধে জাতির বুদ্ধিবিকার ঘটিয়ে তাকে চরম দুর্গতির পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে ; তারই অনিবার্য ফলে, শুধু বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও সে রয়েছে পঙ্গু হয়ে।

বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ছড়িয়ে পড়ে তার চিত্তক্ষেত্রে, তাই ধীরে ধীরে সেখানে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে ; দেশ অভিষিক্ত হয়ে ওঠে বিজ্ঞানশিক্ষায়। বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সেসব দেশ 'তাদের' সাহিত্যের সহায়তা গ্রহণ করেছে ; এই কর্তব্যসাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা শুধু যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তা নয়, ভাষা প্রয়োগেও তাঁরা নিপুণ। বিষয়বস্তু যথোচিত সরল করে তা জনসাধারণের আয়ত্তগম্য সীমায় পৌঁছে দেবার দক্ষতা তাঁদের অসাধারণ ; উচ্চতন স্তরের দান নিম্নতন স্তরে নিত্যই বর্ষিত হয়ে উর্বরা করে তুলছে তাঁদের দেশের চিত্তভূমিকে। এই পুণ্যকর্মে স্যর জেমস জিন্‌স অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর লেখা প্রত্যেকটি বই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অনেক বিজ্ঞানী আমাদের দেশেও আছেন, কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের অনেকেরই শিক্ষার দান থেকে বঞ্চিত ; প্রয়োগের দিক থেকে 'অভিশপ্ত কচের' মতো তাঁদের শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এদেশে বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে থাকে একান্তভাবে বিদেশীভাষার ভিতর দিয়ে, অনভ্যস্ত এই ভাষায় সে-শিক্ষা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে না। "মনের চিন্তা ও ভাব কথায় প্রকাশ করার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ, সেই সাধনাকে পরভাষা দিয়ে ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে।" যে-পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষা এদেশে আজ প্রবর্তিত, দেশের মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য ; দেশের শিক্ষা ও তার বৃহৎমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, দেশের প্রাণের ধারার সঙ্গে এই শিক্ষার যোগ খুব কম, বাইরের স্থূল উপাদানই অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে আসল জিনিসটাকে দিয়েছে চাপা। অনেকদিন ধরে এই অনৈক্যের অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে আজ জাতির চিন্তাশক্তিতে এনেছে এক সাংঘাতিক জড়তা। এই জড়তার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-শিক্ষার ভূমিকা করে দেওয়া একান্ত আবশ্যক ; তারই বোধ সঞ্চারিত হয়েছে আজ দেশের সর্বত্র। বিজ্ঞানশিক্ষা যাতে পাশকরা-বিদ্যা না হয়ে প্রাণগত আপনকরা-বিদ্যা হয়ে উঠতে পারে তারই বিপুল সাড়া জেগেছে দেশময়।

বিষয় হিসেবে বিজ্ঞান যাতে সহজে আয়ত্তগম্য হয় তার জন্য প্রথম প্রয়োজন মাতৃভাষায় সহজ করে বিজ্ঞানের তথ্য আহরণ করা। এই মহান পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে এক সুনির্দিষ্ট ধারা নির্দেশ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থে। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার বিপুল দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেছেন আমাদেরই মতো কয়েকজন

অক্ষমের হাতে ; এ-বিষয়ে তাঁর আদেশ ছিল—"বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, তোমাদের পাণ্ডিত্য ও দুরূহ বাক্যজালের আঘাতে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে দুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো ; আর তথ্যের বোঝা হালকা করে অযথা ফেনার যোগান দিয়ে তার পাতটাকে প্রায় ভোজশূন্য করোনা। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।"

তাঁরই আদেশ শিরোধার্য করে এই দুর্গম পথে চলেছি কঠোর বাধা ও নির্মম সমালোচনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। আজ ভাগ্যবিপর্যয়ে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে আমি নির্বাসিত, তারই প্রত্যন্ত দেশে অন্তেবাসী। এই কঠিন কর্তব্যসাধনে ভারকেন্দ্র-ভ্রষ্ট এই বঞ্চিতের প্রয়াস কতদূর সফল হয়েছে তার বিচারের ভার রইলো আপনাদের হাতে।

এই বইয়ে যে-বিষয়বস্তুর আলোচনা স্যর জেমস জিন্‌স করেছেন, প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে তা মোটেই সহজবোধ্য নয়, কিন্তু ভাষা-প্রয়োগের অসাধারণ নৈপুণ্যে ও অতি সহজ দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে অতি সুন্দরভাবে তিনি তাকে অনেকক্ষেত্রেই তাদের আয়ত্তগম্য সীমায় পৌছে দিয়েছেন। এই অনুবাদে যদি সেই ধারা ক্ষুণ্ণ না হয়ে থাকে তাহলেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

শান্তিনিকেতন শিক্ষায়তনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্. এ. ও কেন্দ্রিয় শিক্ষাবিভাগের ডক্টর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন এম্. এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন), শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুদ্বয়, বরাবরই আমার এরূপ প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন তাঁদের মূল্যবান উপদেশ ও সমালোচনা দিয়ে ; এ ক্ষেত্রেও তাঁদের স্নেহের দান থেকে বঞ্চিত হব না বলেই আশা করি।

সিগনেট প্রেসের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার গুপ্ত আমার মতো

অযোগ্য ব্যক্তিকে এই অনুবাদের গুরুভার অর্পণ করেছেন; তাঁর নির্বাচনের প্রশংসা করতে পারি না। কথাটা উল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যে যে অগৌরবের গ্লানি যেন সবটাই এই দুর্বলের উপর চেপে না বসে, অপনির্বাচনের বোঝা তাঁর শক্ত কাঁধে তিনিও খানিকটা বহন করুন। তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাঁর অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের জন্য; আমার মতো অলসকে নাড়া দিয়ে এই কঠিন কাজ সমাধা করাতে তাঁর মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

২।৪২ বালিগঞ্জ গার্ডেনস
বালিগঞ্জ : কলিকাতা

—প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

****
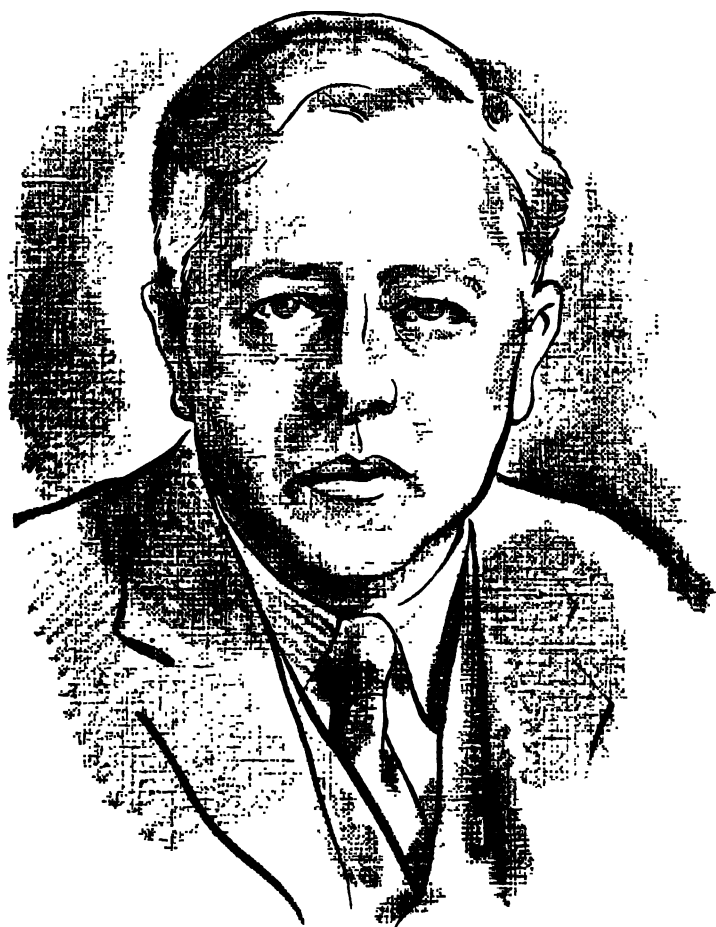
স্যর জেমস জিন্‌স

"কালের প্রারম্ভে আমাদের বাস। পৃথিবী এখনও রয়েছে তার শৈশবে, হয়তো তার স্থিতিকাল আরো কোটি কোটি বছর; আকস্মিক কোনো অপঘাত না ঘটলে আশা করা যায় মানুষও ততদিন বেঁচে থাকবে!"
স্যর জেমস জিন্‌স খ্যাতনামা গণিতবেত্তা, লঘুভাবে এরূপ উক্তি করার লোক তিনি নন; এর অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণও তিনি সংগ্রহ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রকৃষ্ট ভাগই এই সাধনায় নিয়োজিত।
১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি থেকে এই জ্ঞানের সূত্রপাত, যেদিন পাদুয়ার গ্যালিলিও গ্যালিলাই তাঁর নিজের হাতে তৈরি দূরবীনের সাহায্যে সর্বপ্রথম নক্ষত্রলোকের রহস্য অবারিত করেন। এই ৭ই জানুয়ারি "মানুষের ভাগ্য পরীক্ষার দিন," স্যর জেমস বলেন, "বিপ্লব সূচনাকারী"। কারণ এরপর থেকেই মানুষের অস্তিত্বকে এক নূতন আলোকে দেখতে হয়েছে, তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিচার করতে হয়েছে এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।
বস্তুতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে গ্যালিলিওর জন্মের অনেক আগে; প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে পিথাগোরস্‌ প্রচার করেছিলেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পৃথিবীর উৎপত্তি কালের তুলনায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্ভব মাত্র সেদিনকার কথা। পৃথিবীতে প্রাণের স্থিতিকালের লক্ষভাগ হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের বয়স।

স্তর জেমস নির্ধারিত নিচের তালিকা থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে :

পৃথিবীর বয়স প্রায় ২০০ কোটি (২০০০,০০০,০০০) বছর।

পৃথিবীতে প্রাণের স্থিতিকাল প্রায় ৩০ কোটি (৩০০,০০০,০০০) বছর।

মানুষের স্থিতিকাল প্রায় ৩ লক্ষ (৩০০,০০০) বছর।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বয়স প্রায় ৩ হাজার বছর (৩,০০০) বছর।

দুরবীন সম্মত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বয়স প্রায় ৩ শত (৩০০) বছর।

স্তর জেমস বলেন, সূর্যের বয়স ৮ লক্ষ কোটি বছরের বেশি হতে পারে না। পৃথিবীসৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত সূর্যের অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি, তার সমগ্র স্থিতিকালের তুলনায় পৃথিবীর ২০০ কোটি বছর এতো অকিঞ্চিৎকর যে, এই ক্ষুদ্র কালমাত্রায় তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি ব'লেই ধরে নিতে পারি।

একশো বছরও হয়নি নক্ষত্রের দূরত্বমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে; অতি আধুনিক পরিমাপ থেকে জানা গেছে নিকটতম নক্ষত্রদলের দূরত্ব, নিকটতম গ্রহদলের দূরত্বের দশ লক্ষ গুণ।

শুক্র গ্রহের দূরত্বমাত্রা ২ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল; নক্ষত্রলোকে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী প্রক্সিমা সেণ্টরীর (Proxima Centauri) দূরত্ব হল ২৫ লক্ষ কোটি মাইল বা ৪'২৭ আলো-বছর (light-year)—অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিবেগে ধাবিত আলো, একটানা ৪'২৭ বছর ধরে চললে, যতটা পথ অতিক্রম করবে। দূরতম নীহারিকার দূরত্বমাত্রা ১৪ কোটি আলো-বছর।

পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকের সীমানায় প্রবেশ করলেই সংখ্যার ভাষাটা প্রলাপের মতো শোনায়; এই বিপুল অঙ্কপাতই বিজ্ঞানীর মনে এ-ধারণার উদ্রেক করেছে যে, 'দেশ' সীমাহীন। এখন আইন্‌স্টাইন্‌ প্রমাণ করেছেন বলে দাবী করেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের মতোই, 'দেশ'

আপনারই উপর আপনি বেঁকে পড়েছে। তাই আলো, এক নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে, সমগ্র 'দেশ'কে প্রদক্ষিণ করে, আবার সেই বিন্দুতেই ফিরে আসতে পারে। কাজেই এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়, দুপুর রাতে নির্ধারিত দিকে এক বিশেষ শক্তিশালী দূরবীন নির্দেশ করলে, সূর্য ও তার প্রতিবেশী নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেখতে পাওয়া যাবে। এদের দেখা যাবে সেই আলোতে, যে-আলো বিশ্বকে প্রদক্ষিণ করে এসেছে—এ-দেখা, বর্তমানে এসব জ্যোতিষ্ক যে-অবস্থায় 'রয়েছে,' তা নয়, কোটি কোটি বছর আগে এরা যে-অবস্থায় 'ছিল' বিশ্বপ্রদক্ষিণকারী আলো আমাদের কাছে সেই খবরই পোঁছে দেবে।

মানুষের বিশ্ব (*Man's Universe*)

স্যর জেমসের মতে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের বর্তমান প্রধান আলোচ্য বিষয় হল—মানুষ যে-বিশ্বের অংশবিশেষ ও বিশ্ব যে-মানুষের অংশবিশেষ, সেই বিশ্বলোকের সঙ্গে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর প্রাণলোকের কী সম্বন্ধ, এই প্রশ্নের উপর জ্যোতির্বিজ্ঞান যে-আলোক-সম্পাত করেছে তার বিচার করা। যে-বিশ্ব থেকে মানুষের সমগ্র ইন্দ্রিয়বোধ জন্মায় তাকেই প্রথম উপলব্ধি করতে হবে, যদি মানুষ নিজেকে সম্যক উপলব্ধি করতে চায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী জানেন, এই পরম উপলব্ধিই "অন্ধকারে-ঢাকা অজ্ঞাত প্রদেশের অন্তর্বর্তী প্রাণলোকের ক্ষুদ্র আলোকশিখার" (life's little lantern between dark and dark) বাইরে দৃষ্টিপাত করতে আমাদের সহায়তা করে। বিশ্বলোককে বুঝতে হলে "দেশ ও কালের ভিতর দিয়ে" (Through Space and Time) মানুষকে ঘুরে বেড়াতে হবে।

যাত্রা শুরু করার পূর্বে আমাদের পথপ্রদর্শকের সম্বন্ধে হয়তো কিছু খবর

নেওয়া ভালো ; এই পথপ্রদর্শক হলেন পৃথিবীর সুধিসমাজে একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। দেখা যাক তিনি কী ধরনের লোক !

বয়স একষট্টি বছর, সৌম্যের প্রতিমূর্তি, বিজ্ঞানের তথ্যাবলী সাধারণের আয়ত্তগম্য সীমায় পৌঁছে দেবার অদ্বিতীয় একনিষ্ঠ সাধক স্যর জেমস জিন্‌স ; তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কিছুই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয়। বলা যেতে পারে তিনি তাঁর বংশের একমাত্র ব্যতিক্রম ; পুরুষানুক্রমে তাঁদের পরিবার সংবাদপত্রসেবী হিসাবে খ্যাত।

তাঁর দাদামশায় রবার্ট জিন্‌স ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের একটি সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী। রবার্টের ছেলে উইলিয়ম ছিলেন হাউস্ অব্ কমন্‌সের সাংবাদিক ; তাঁর ছেলে 'রয়টারের' হার্বাট জিন্‌স তাঁর স্থান গ্রহণ করেন। রবার্টের দ্বিতীয় ছেলে 'লিভারপুল পোস্ট' পত্রিকার স্যর আলেকজাণ্ডার জিন্‌স, তাঁর ছেলে এলান জিন্‌স তাঁর স্থান অধিকার করেন। স্যর জেমস জিন্‌সের বাবাও ছিলেন একজন সংবাদপত্রসেবী।

তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানী যাঁর হাতে আজ পর্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থের রচনা হয়েছে, তাঁর এই অসামান্য সাফল্যের মূলে হয়তো রয়েছে তাঁর পরিবারের সাহিত্যিক প্রতিভা। এই গ্রন্থরচনায় তাঁর অসাধারণ সফলতার নিদর্শন, বর্তমান গ্রন্থ 'বিশ্ব-রহস্য' ; এর এক লক্ষ তেইশ হাজার (১,২৩,০০০) কপি বিক্রয় হয়েছে, আরো দুখানা গ্রন্থের প্রত্যেকটিরই বত্রিশ হাজার (৩২,০০০) কপি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতো স্যর জেমসও অর্থলিপ্সু নন ; তা ছাড়া আমেরিকাবাসিনী এক ধনী কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁর মৃত্যুতে তিনি প্রায় ১২ লক্ষ টাকার অধিকারী হন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ভিয়েনার সুসি হক, এই বিবাহে তাঁর একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে।

বহু সংখ্যক গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত থাকলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে

তিনি কখনো এতটুকু শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন বলে কেউ তাঁকে অপবাদ দিতে পারবে না; তাই তাঁর কর্মজীবন হয়েছে উজ্জ্বল ও গৌরবময়। যে-সব উপাধি তিনি লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল—অক্সফোর্ড, ম্যানচেষ্টার ও ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস্-সি; অ্যাবারডীন, জন্ হপকিন্স্ ও সেণ্ট এণ্ড্রুজের এল্. এল্. ডি।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে, বিভিন্ন শিক্ষায়তনে যে-সব পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন বা এখনও আছেন তা হল—প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক গণিতের অধ্যাপক, রয়েল সোসাইটির সেক্রেটারী, মাউণ্ট উইল্সন্ মানমন্দিরের গবেষণা সমিতির সদস্য, ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট, রয়েল ইন্স্টিটিউশনের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক, সমাজ ও শ্রমশিল্প গবেষণা বিভাগের মন্ত্রণাসমিতির সদস্য।

এই অসম্পূর্ণ বিবৃতি থেকে যা মনে হয়, মানুষ হিসেবে তিনি তার অনেক উপরে। সঙ্গীতের উপর তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক উন্নতি হবে, একাগ্রতা-শিক্ষার বক্তৃতা শুনিয়ে নয়, ক্রীজখেলার সুযোগ দিয়ে। "আপন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী বেছে নিয়ে তাদের বিচার করার ক্ষমতাকেই" মনস্তত্ত্ববিদ বুদ্ধির (intelligence) সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অনেকেই, প্রাসঙ্গিক তথ্য নির্বাচনের এই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।

(তথ্য) ভারাক্রান্ত মন (*Weighted Mind*)

তিনি স্বীকার করেন, "তিন চার বছরের শিশুর বুদ্ধিপরিমাপক পরীক্ষা (Intelligence Test) আমাকে দিতে হলে, খুব সুবিধা করে উঠতে পারব ব'লে তো মনে হয় না; কারণ ব্যসকলন (Differential

Calculus) ও আপেক্ষিকবাদের তথ্যাবলীতেই আমার মন অতিমাত্রায় অভিভূত।" আমাদের শিক্ষাবিধান এমন এক সময়ে প্রবর্তিত হয়েছে যখন মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল অত্যধিক দুর্লভ, শিক্ষার্থীদের বাধ্য হয়ে খুশি থাকতে হতো শুধু বক্তৃতা শুনেই।

সঙ্গীতকে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করতে ভালোবাসেন— যেমন, "এক হাজার গম্ভীর গলার উচ্চ ঐকতানে যে-শক্তির উদ্ভব হয় তা বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হলে ৩০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটিমাত্র বিজলীবাতিকে জ্বালিয়ে রাখতে পারে।"

'স্ট্রেডিভেরিয়স্' নির্মিত বেহালার অপূর্ব সুরের মাধুর্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "মনে হয় র‍্যণ্টগেন-রশ্মির বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে যথাসময়ে এই পুরানো বেহালার সুরমাধুর্যের রহস্য অবারিত হবে, তখন ইচ্ছে করলে সঙ্গীতযন্ত্র নির্মাতার দল এই 'স্ট্রেডিভেরিয়স্' বেহালার বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন বহুসংখ্যক বেহালা তৈরি করতে সক্ষম হবেন।"

এই হল আমাদের বিশ্বসমুদ্রযাত্রার নিপুণ কর্ণধার; তাঁকেই অনুসরণ করে এখন যাত্রা শুরু করা যাক বিশ্বলোকে, পৃথিবী ছাড়িয়ে "যে-পৃথিবী ধূলিকণার মতোই অতিক্ষুদ্র, অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তুকণার সঙ্গে যে তার আপন আয়তনের দশলক্ষ গুণ বড়ো এক সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। অসীমের কাছ-ঘেঁষা বিরাট দেশমাত্রায় এই সূর্য আবার বালুকণার মতোই ক্ষুদ্রায়তন।" পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রতীরে যে-অগণিত বালুকণা সঞ্চিত রয়েছে, আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যাও প্রায় তাই।

বিশ্বসংস্থিতিতে পৃথিবী কোনো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নেই, শূন্যপ্রায় দেশসমুদ্র দিয়ে পরিবেষ্টিত এ যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। মাত্র অল্পদিন হল গণিতবেত্তা প্রমাণ করেছেন যে এই 'দেশমাত্রা' স্থির হয়ে থাকতে পারে না, তার আয়তন ক্রমাগত বেড়েই চলবে।

স্যর জেমস এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"বলছি না যে এই মুহূর্তে লণ্ডন বারমিংহাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বা তোমার আমার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান বেড়ে চলেছে ; যদিও আমার মনে হয় একথা সত্যি যে বিশ্বগোলকের বিস্ফারণ না ঘটলে আমাদের পরস্পর যে-আপেক্ষিক অবস্থান হতো, এই বিস্ফারণের ফলে আমরা তার চেয়ে একটু দূরে সরে গেছি।" তিনি বলেন, এই বিশ্ব যার বিপুলতার মধ্যে এখন যাত্রা শুরু করছি, সে হল, 'দেশমাত্রার' যথার্থ প্রতীক। "কঠিন পৃথিবীপৃষ্ঠের মতো এর রূপ নয়, এ হল চিরবিস্ফারমান সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ বা বেলুনের উপরিতলের মতো ; এই বিস্ফারণের জন্যই দেশমাত্রায় অবস্থিত বস্তুসংঘের পরস্পর ব্যবধান ও পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বমাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলবে, যে-বস্তুর দূরত্বমাত্রা যত বেশি তার দূরে সরে যাবার গতিবেগও ততই বেশি।" এ হল এক পরম আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ধারণা, প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয় ; কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানী এমন সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন যাতে এর যাথার্থ্য প্রমাণ হয়েছে বলে মনে হয়।

পাসাডেনার মাউণ্ট উইল্‌সনের বৃহৎ দুরবীনের যন্ত্রদৃষ্টিতে এত দূরবর্তী সব জ্যোতিষ্ক ধরা পড়েছে যাদের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে লাগে ১৪ কোটি বছর। মানুষের আবির্ভাবের বহুপূর্বে পৃথিবী যখন প্রকাণ্ড সরীসৃপ, ডাইনোসর ও মস্ত দাঁতওয়ালা পাখির বাসস্থান ছিল তখন এ-সব জ্যোতিষ্কের আলো যাত্রা শুরু করেছে মহাশূন্যের পথে ; সুদূর শূন্যপথ অতিক্রম করে আলোর এই মহাযাত্রা আজ শেষ হয়েছে পৃথিবীতে এসে। এই আলোই তাদের অস্তিত্বের খবর এনে দিচ্ছে আমাদের কাছে। (মহাশূন্যের গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত জ্যোতিষ্কের দল পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এক প্রচণ্ড বেগে, তাদের এই মহাদৌড়ের মাত্রা মিনিটে প্রায় ১০ লক্ষ মাইল।)

সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসছে যে বর্তমান সমস্যা "গতি নিয়ে, স্থিতি নিয়ে নয়।" বিশ্ব স্থির হয়ে নেই, তার বিস্ফারণ ঘটছে এক বিপুল বেগে, যে-বেগের প্রচণ্ডতার সঙ্গে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ-বেগের সুদূর তুলনাও চলে না। বিশ্ব অনাদি অনন্ত সৃষ্টির প্রতীক নয়; অতীতের কোন এক অজ্ঞাত কালমাত্রায় তার আরম্ভ, আমাদের চোখের সামনে ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে।

এই বিস্ফারমান বিশ্ব সম্বন্ধে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর আরো অনেক তথ্যের সন্ধান দেবেন স্যর জেমস—

আধুনিক ধারা

আধুনিক বিজ্ঞানের ধারা হল সমগ্র জড়বিশ্বকে তরঙ্গে বিভক্ত করা, এই তরঙ্গকে বলা হয় বিকিরণ বা আলো। জড়ের ধ্বংসপ্রক্রিয়া হল আবদ্ধ তরঙ্গ-তেজকে বন্ধনমুক্ত করে মহাশূন্যের পথে তাকে সঞ্চারিত করা।

"এ-সব ধারণা বিশ্বকে পরিণত করেছে এক প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশিত আলো-বিশ্বে; এর সমগ্র সৃষ্টিইতিহাস নিখুঁতভাবে বলা যায় এই ক'টি শব্দ প্রয়োগ করে—'ভগবান বললেন, আলোর আবির্ভাব হোক' (God said let there be light)।"

স্যর জেমসের মত, বিশ্বের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বর্তমানে অচল। বিজ্ঞান ফিরে গেছে দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধানে। কালপ্রবাহের বিপরীত দিকে চলতে শুরু করলে, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর যে কালের আদি উৎসে পৌছব তার অনেক নিদর্শন মিলবে; এই উৎস এমন এক কালমাত্রা যার পূর্বে বর্তমান বিশ্বলোকের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আবার এমন একদিন আসবে যখন বিশ্ব হবে লুপ্ত। তাপগতিবিদ্যার

নিয়মাবলী অনুসারে প্রকৃতির সব কিছুই এক চরম অবস্থায় গিয়ে পৌছবে, তখন তার অগ্রগতি হবে রুদ্ধ, বিশ্বের ঘটবে মৃত্যু।

স্যর জেমস স্বীকার করেন—"বর্তমানে বিশ্বপ্রকৃতির যে-সব ছবি বিজ্ঞান উপস্থিত করেছে, আর পরীক্ষিত তথ্যের সঙ্গে যাদের সঙ্গতি রয়েছে ব'লে মনে হয়, তাদের সবই 'গাণিতিক ছবি'।" তাঁর মতে "বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে খাঁটি-গণিতের ধারা মেনে, আর মহান বিশ্বশিল্পীর আবির্ভাব হচ্ছে এক খাঁটি-গণিতবেত্তা রূপে (pure mathematician)।"

বিজ্ঞানের যে-সব শাখা বিশ্বের মূলপ্রকৃতি অবারিত করতে সচেষ্ট, গণিতবেত্তা ছাড়া আর কেউ তাদের উপলব্ধি করার আশা করতে পারেন না। খাঁটি-গণিত যেমন খাঁটি চিন্তা, বিশ্বসৃষ্টিও তেমনি চিন্তারই ক্রিয়াবিশেষ ; বিশ্বলোকও খাঁটি-চিন্তার জগৎ।

"জড়রাজ্যে মনের আবির্ভাবকে এখন আর আকস্মিক ও অনধিকার প্রবেশ ব'লে মনেই হয় না, বরং এই রাজ্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ব'লে তাকে স্বাগত অভিনন্দন জানানো আমাদের কর্তব্য—এই মন আমাদের পৃথক মন নয় : এ হল এক 'সর্বগত মন' (Universal Mind), যেখানে আমাদের পৃথক মন সৃষ্টিকারী পরমাণুর দল 'চিন্তা'রূপে বিরাজমান।"

তিনি বলেন, "দেখতে পাই, বিশ্বে ভর করে আছে একটা সৃষ্টি ও সংযমের শক্তি, যে-শক্তির সঙ্গে আমাদের পৃথক মনের খানিকটা মিল রয়েছে ; ভাবাবেগ, নীতি ও সৌন্দর্যবোধের স্থান সেখানে নেই, অন্তত আজও তাদের কোনো সন্ধান মেলেনি। সেখানে রয়েছে এক 'চিন্তার উদ্যম' যাকে বলতে পারি 'গাণিতিক', এর চেয়ে ভালো শব্দসম্পদ নেই বলে।"

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ থেকে এরূপ কল্পনা করতে বাধ্য হই যে, শিল্পী যেমন তাঁর চিত্রপটের বাইরে থেকে কাজ করে যান, বিশ্বশিল্পীও

তেমনি তাঁর সৃষ্টির কাজ করে চলেছেন 'দেশ ও কালের' বাইরে অবস্থান করে; এই 'দেশ-কাল' তাঁরই সৃষ্টির অংশমাত্র। বস্তুতঃ এই মত প্লেটোর সময়কালীন: "কাল ও আকাশের সৃষ্টি একই মুহূর্তে, যাতে কখনও তাদের অবসান ঘটলে যেন একই সঙ্গে ঘটতে পারে। 'কালের' সৃষ্টিকার্যে এই ছিল স্রষ্টার অভিপ্রায় ও চিন্তা।"

এবার এই অভিনব বিশ্বলোক-যাত্রা শুরু হল; যাত্রাপথের প্রথম ধাপেই সাক্ষাৎ ঘটে সূর্যের উপগ্রহ 'বুধ'-এর সঙ্গে, এখানে বেশিক্ষণ থাকলে অসহনীয় উত্তাপে কাট্‌লেটের মতোই উত্তপ্ত হওয়ার অবস্থা হবে। এই গ্রহে বায়ুমণ্ডল নেই, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

অক্সিজেন-ক্ষুধা (*Oxygen Hunger*)

স্যর জেমস এক সর্বগত অক্সিজেন-ক্ষুধা সপ্রমাণ করার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলগ্রহ ও পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও এই অক্সিজেন বায়বের সন্ধান মেলেনি। ফারেন্‌হাইট্ পদ্ধতির শূন্যাঙ্কের ২৯০° ডিগ্রি নিম্নতাপমাত্রায় অবস্থিত তরল অক্সিজেন কোনো পাত্রে রাখা হল; এক টুকরো অঙ্গার আগুনে গরম করা হলে, সাধারণ অবস্থায় হাওয়ার মধ্যে নারাঙি রঙ ধরে তার মৃদুদহন চলতে থাকে, কিন্তু উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটে না। তরল হাওয়ায় ফেলে দিলে এই উত্তপ্ত অঙ্গারখণ্ড একটা তীব্র অগ্নিশিখায় জ্বলে ওঠে, বেশির ভাগ অক্সিজেন আত্মসাৎ করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দ্রুতদহনে নিঃশেষ হয়ে যায়।

এর পর যাত্রা করা যাক মঙ্গলগ্রহে, এই গ্রহের অধিবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এরূপ ভরসা নিয়ে। স্যর জেমস এরূপ আশা পোষণ করার পক্ষপাতী। জীবনধারণযোগ্য অক্সিজেন এই গ্রহে আছে ব'লে তিনি মনে করেন; এখানে তাপমাত্রা খুব কম, তবে শীতকালে

আমেরিকার ক্যানাডা অঞ্চলের চেয়ে কম নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা হয় যে, হয়তো প্রমাণ হয়ে যাবে, এই গ্রহের খালগুলি নিছক কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই নয়; আবছা আলোতে কাজ করার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিভ্রম মাত্র। এখানে প্রাণের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না, আশাভঙ্গে বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হবে এখানে হয়তো কোনো মানুষ নেই।

বৃহস্পতি গ্রহে আমাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয়; এর বায়ুমণ্ডল কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের সংমিশ্রণ, এই দুই বায়বের সম্মিলিত প্রভাবে একবার কাঁদতে হবে, পরমুহূর্তেই আবার হাঁচতে হবে। নিঃশ্বাস নেওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর উপর যতটা লাফাতে পারি এখানে লাফানো চলবে তার তিনভাগের একভাগ মাত্র। স্তর জেমস বলেন এই অস্বস্তিকর চাপের হাত এড়াবার সব চেয়ে ভালো উপায় জলের ভিতর সমস্ত শরীর ডুবিয়ে রাখা। কিন্তু অসুবিধা হল, এই গ্রহের তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের ২৪০° ডিগ্রি নিচে ব'লে এখানে জলের সন্ধান পাবার সুদূর সম্ভাবনাও নেই।

এর একটি উপগ্রহের আকার ডিমের মতো, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এই গ্রহের দিকে; যতই নিকটবর্তী হচ্ছে এই অনুচরগ্রহ ততই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। 'শীঘ্রই' (কোনো নির্দিষ্ট তারিখের কথা স্তর জেমস উল্লেখ করেননি) এই উপগ্রহ বৃহস্পতির বিপদ-গণ্ডীতে (Danger Zone) প্রবেশ করবে; সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে প্রথমে দুটি টুকরোতে, তারপর অসংখ্য ক্ষুদ্র টুকরোয়। শনিগ্রহের মতো বৃহস্পতিরও সৃষ্টি হবে কতকগুলি বেষ্টনী (Rings)।

আমাদের চাঁদও পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে! সমুদ্রে জোয়ার সৃষ্টির প্রধান কারণ হল চাঁদ; সমুদ্রের উদ্বেল জলরাশি নিচের কঠিন

পৃথিবীর উপর আকর্ষণ বিস্তার করে তার আবর্তনের গতি দিচ্ছে কমিয়ে, ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। স্যর জেমস ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—"অদূর ভবিষ্যতে চাঁদ পৃথিবীর বিপদ-গণ্ডীতে প্রবেশ করে বিভক্ত হয়ে পড়বে দুটি পৃথক অংশে। তারপর এই টুকরো দুটি আবার ভেঙে পড়বে, সৃষ্টি হতে থাকবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর চাঁদের দল; তখন দিনে রাতে সব সময়ই চাঁদের আলোর একটানা বর্ষণ চলবে পৃথিবীর উপর।"

এ-ঘটনা দেখে যাবার সৌভাগ্য আমাদের হবে না; কারণ হিসেব করে দেখা গেছে ঘটনাটা দুঃসম্ভব, ৫ কোটি বছরের মধ্যে এরূপ অপঘাত ঘটবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হবে তা পূর্বাহ্নেই তিনি বলে দিয়েছেন এক ধারাবাহিক স্পষ্ট কথা-চিত্রে (Word-Picture):

১। পৃথিবীর দুদিকে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে জোয়ারের ঢেউ; বস্তুতঃ সাগরের জলে এই উচ্ছ্বাসের মাত্রা মধ্য-আট্‌লাণ্টিকে ৩ ফুটের বেশি উঁচু হয় না। ভূমি-অংশের প্রতিরোধে কোথাও কোথাও—যেমন ফাণ্ডে উপসাগরে (Bay of Funday)—এর উচ্চতা ৭০ ফুট পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। পরিশেষে এই জোয়ারের প্রভাবে পৃথিবী ও চাঁদের, আবর্তন ও প্রদক্ষিণের গতিতে পূর্ণসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যাবে। এই অবস্থায় পৃথিবীর একদিক সব সময় চাঁদের দিকে ফিরে থাকবে, তার এক গোলার্ধের অধিবাসীর দল চাঁদকে কখনো দেখতেই পাবে না। সূর্য ও চাঁদের সম্মিলিত আকর্ষণের ফলে যে-জোয়ারের সৃষ্টি হবে, তার প্রভাবে পৃথিবীর আবর্তন-গতি যাবে আরো কমে; চাঁদ তখন এগিয়ে আসবে পৃথিবীর দিকে—পৃথিবী-চাঁদের দূরত্বমাত্রা যাবে কমে।

২। দ্বিতীয় চিত্রে তিনি এর চরম পরিণতি নির্দেশ করেছেন। চাঁদের ক্রমবর্ধমান সান্নিধ্যে শুধু যে পৃথিবীর উপর এক বিপুল জোয়ার-স্ফীতির

(tide bulge) সৃষ্টি হবে তা নয়, তার নিজের উপরও এমন এক প্রবল আকর্ষণের উদ্ভব হবে যে, সেখানেও জেগে উঠবে এক বিপুল জোয়ার-স্ফীতি।

চাঁদের ভাগ্যলিপি *(Moon's Fate)*

৩। তৃতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে এর সম্ভাব্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। স্যর জেমস বলেন, "পৃথিবীর আকর্ষণে চাঁদের কঠিন দেহে যে-জোয়ারের সৃষ্টি হবে, তারই আঘাতে চাঁদ ভেঙে পড়বে টুকরো টুকরো হয়ে; এই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র টুকরোগুলি তখন দলবদ্ধ হয়ে, পৃথক উপগ্রহের মতো, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।"

৪। চতুর্থ চিত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে চাঁদের চরম-দশা—টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়া ও এই টুকরোগুলির পৃথিবীকে অবিরত প্রদক্ষিণ করা, শনিগ্রহের বেষ্টনীর টুকরোগুলির শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করার মতো।

৫। পঞ্চম চিত্রে দেখানো হয়েছে আকাশপথের এক অভিনব দৃশ্য, যুক্তরাষ্ট্রের অক্ষাংশ সমূহে যার সন্ধান পাওয়া যাবে ব'লে আশা করা যায়। চাঁদের অসংখ্য ভাঙা টুকরো আকাশের দক্ষিণাংশে বিস্তৃত হয়ে এক উজ্জ্বল নিরবচ্ছিন্ন অর্ধচক্রের মতো শোভা পাবে; শনিগ্রহ যেমন তার বেষ্টনীর উপর ছায়া ফেলে তেমনি পৃথিবীও তার ছায়া ফেলবে এই অর্ধচক্রের উপর, মনে হবে এই উজ্জ্বল আলোকবেষ্টনীতে যেন খণ্ডগ্রহণ লেগেছে।

বিশ্বলোক পর্যটনে যে-সব তথ্যের আবিষ্কার হল, তাদের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ভার রয়েছে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ পথপ্রদর্শকের উপর। মন তাঁর নিয়ত প্রগতিশীল, তাই বর্তমান অবস্থাগুলির বিশ্লেষণ করেই তিনি ক্ষান্ত নন, তাঁর গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সম্মুখ দিকে। "ঐ

প্রত্যন্ত দেশ থেকে কোন বার্তাবহ ইশারা আসছে?"—এই চিত্তাকর্ষক চিরন্তন সমস্যার কথা তিনি ভেবে দেখতে বলেন।

এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে তিনি এক নূতন মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিজ্ঞানী ও বিশ্বপ্রকৃতি পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক, এখন আর তা বলা যায় না। "বিশ্বপ্রকৃতিকে এখন আর দূরবর্তী এরোপ্লেন থেকে পরিসন্ধান করা মরুভূমির মতো মনে হয় না; পরিসন্ধান করতে হলে তাকে মাড়িয়ে যেতে হবে, প্রতি পদক্ষেপে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে। পরমাণুর অন্তর্নিহিত কর্মপদ্ধতিপর্যবেক্ষণের প্রয়াস, অনেকটা প্রজাপতির ডানা কেটে তার ওড়ার প্রক্রিয়া অনুধাবনের প্রচেষ্টার মতো বা বিষপান করে তার ক্রিয়া আবিষ্কারের চেষ্টার মতো।"

"প্রত্যেক পর্যবেক্ষণে বিশ্বের পর্যবেক্ষিত অংশ লোপ পায়, তাই বিশ্বের কেবলমাত্র অতীত অবস্থা সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান জন্মায়।"

তিনি বলেন, এই বিশ্বপ্রকৃতি অনেকটা রামধনুর মতো। পুরাকালে য়িহুদীরা মনে করত, "রামধনু আকাশে নিবদ্ধ বাস্তব একটা-কিছু, ভগবান ও মানুষের মধ্যে একটা চুক্তির নিদর্শন, চেকের উপর স্বাক্ষরের মতোই এর বাস্তবতার মাত্রা।"

এখন জানা গেছে এই বাস্তব রামধনু নিছক ভ্রান্তি মাত্র। বৃষ্টির ফোঁটা, সূর্যের আলোকে নানা রঙের রশ্মিতে বিভক্ত করে; যে-রঙিন রশ্মি একজনের চোখে এসে পড়ে তা আর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির চোখে পড়তে পারে না, তাই দুজনের পক্ষে একই মুহূর্তে একই রামধনু দেখা অসম্ভব।

প্রত্যেকের রামধনুই তার চোখের রশ্মি নির্বাচনের উপর নির্ভর করে; একটা জড়গত বাস্তবতা থেকে একটা আত্মগত নির্বাচন, যা মোটেই রামধনু নয়।

সর্বত্রই প্রকৃতি আমাদের অনুসরণ করে চলেছে। যে-কোনো গতিবেগ নিয়েই আমরা অগ্রসর হই না কেন, প্রকৃতি এই গতিবেগের সঙ্গে এমনভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে যে এই গতি তার নিয়মাবলীর কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

কিন্তু উপমা একটি ক্ষেত্রে বিফল হয়। আমাদের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে, দূরবর্তী বন ও পাহাড়কে ভূমিকা রূপে আশ্রয় করে যে-গতিবেগে রামধনু চলতে থাকে সেই গতিবেগই নির্দেশ করে আমাদের চলার গতি। কিন্তু প্রকৃতির জন্যে, প্রাকৃত বিজ্ঞান আজও কোনো বিশ্বভূমিকার সন্ধান দিতে পারেনি।

ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম স্বীকার করে একথা বলতে পারি যে আধুনিক বিজ্ঞান আদর্শবাদের পক্ষপাতী। আদর্শবাদ বরাবর একথা স্বীকার করেছে—"যে-পথে প্রকৃতি-পরিসন্ধানে যাত্রা করেছি তার আরম্ভ যখন মনোগত, তখন তার শেষও মনোগত হবার সম্ভাবনাই বেশি।"

এর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান একথা যোগ করেছে—"প্রকৃতির যে-দূরতম প্রদেশে এ পর্যন্ত বিজ্ঞান এসে পৌঁচেছে সেখানকার যা-কিছু মনোগত বলে পরিগণিত হয়নি, তার অধিকাংশই, সম্ভবত সবই, আজ অপাঙক্তেয় বলে পরিত্যক্ত; পরিবর্তে নূতন এমন কিছুর আবির্ভাব ঘটেনি যা মনোগত নয়।"

—এডগার মিডল্‌টন্‌

সায়েনটিফিক বুকক্লাবের প্রকাশক জন গিফোর্ড লিমিটেডের সহযোগিতায় এই প্রবন্ধের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

****

ভূমিকা

নভেম্বর (১৯৩০) মাসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রীড-অভিভাষণকে (Rede Lecture) পরিবর্ধিত করে এই গ্রন্থ রচিত।

অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রাকৃত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের নূতন তথ্যাবলী, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে, আমাদের ধারণার বিপুল পরিবর্তন সাধন করবে। বর্তমান সমস্যা শেষ পর্যন্ত দার্শনিক আলোচনার অঙ্গীভূত ; কিন্তু নির্ধারিত তথ্য ও অস্থায়ী মতবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের তরফ থেকে যা-কিছু বক্তব্য তা না জানা পর্যন্ত দার্শনিকের এ-বিষয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করার অধিকার নেই। এ-সব আয়ত্তাধীন হলে তবেই আলোচনা দর্শনশাস্ত্রের আঙিনায় প্রবেশ করতে পারে।

অনেকটা এরূপ ভেবেই এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু বরাবরই মনে এ-সন্দেহ ছিল যে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যে-বিপুল তথ্যের রাশি লিপিবদ্ধ রয়েছে তার অতিরিক্ত কিছু দেবার অধিকার আমার আছে কিনা। একমাত্র দর্শকের বিশিষ্ট সুবিধা উপভোগ করা ছাড়া, অন্য কোনো যোগ্যতা দাবী করতে পারি না। শিক্ষা বা মনোবৃত্তি কোনো দিক দিয়েই আমি দার্শনিক নই ; আর তা ছাড়া অনেকদিন ধরে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রাকৃত তত্ত্বের পরস্পর বিরোধী আলোচনার ক্ষেত্র থেকে বাইরে রয়েছে।

যে-সব প্রশ্নে আমার আগ্রহ আছে ও চরম দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজনীয় উপকরণ বলে যাদের মনে হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে একটা খুব

মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এই গ্রন্থের প্রথম চারটি অধ্যায়ে। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু যাতে আমার পূর্বরচিত গ্রন্থ 'আমাদের বিশ্বলোক' (The Universe Around Us) এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি ; আশা করি ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী গ্রন্থ হিসেবে একে মনে করা যেতে পারে। মূল যুক্তিধারাকে অব্যাহত রেখে এই গ্রন্থকে সুসম্পূর্ণ করতে যে-সব বিষয়বস্তু অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যাবে।

শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য থেকে ইচ্ছানুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেকেই দাবী করতে পারেন। দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে আগন্তুক হিসেবে, এই গ্রন্থে আলোচ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ও মতবাদ সম্বন্ধে যে-সব ব্যাখ্যা আমি সঙ্গত বলে মনে করি, শুধু তাদেরই সন্নিবিষ্ট করেছি এই অধ্যায়ে। অনেকেই আমার মত মেনে নেবেন না জেনেও এই শেষ অধ্যায়টি লেখা।

ডর্কিং ১৯৩০ জে. এইচ. জিন্স

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ রচনায়, অধুনাতম তথ্যের সঙ্গে, প্রথম চারটি অধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে ও আমার যুক্তিকে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। দেখে দুঃখিত হয়েছি, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রথম সংস্করণের কতকগুলি বিষয়কে ভুল-বোঝা, ভুল-ব্যাখ্যা, এমন কি ভুল উল্লেখ করা হয়েছে ; এদের মধ্যে কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে, কিছু সংশোধন ও কিছু পরিবর্ধিত করা হয়েছে। যুক্তি অধিকতর পরিস্ফুট হবে এই ভরসায় কোথাও কোথাও নূতন বিষয়, কোথাও বা গোটা পৃষ্ঠা যোগ করা হয়েছে।

ডর্কিং, ১লা জুলাই ১৯৩১ জে. এইচ. জিন্স

এখন একটি রূপক দিয়ে বোঝাচ্ছি, বিশ্বপ্রকৃতি কতটা বোধগম্য বা দুর্বোধ্য : মনে করা যাক, মানুষ যেন মাটির নিচে এক গুহায় আবদ্ধ, গুহার একটি মুখ আলোর দিকে খোলা, আর সেই মুখ সোজা চলে গেছে গুহার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। জন্মাবধি মানুষ এখানেই বাস করছে, পা ও গলা এমন ভাবে শেকল দিয়ে বাঁধা যে তাদের নড়াচড়ার কোনো উপায় নেই ; শুধু সামনের দিকেই তাদের দৃষ্টি থাকবে নিবদ্ধ, শেকলে বাঁধা বলে মাথা আর অন্য কোনোদিকে ঘোরাতে পারবে না। তাদের উপরে ও পিছনে একটু দূরে জ্বলছে এক দীপ্তিমান আগুনের শিখা, আর এই আগুন ও তাদের মাঝখানে রয়েছে এক উঁচু পথ। পুতুলনাচ দেখাবার সময় খেলোয়াড় যেমন এক নিচু পর্দা তার সামনে টাঙিয়ে রাখে, একটু তাকালেই দেখতে পাবে সেইরকম এক নিচু দেওয়াল এই পথের সমন্তরাল রেখা ধরে চলে গেছে।

দেখতে পাচ্ছি।

আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ কি একদল লোক এই দেওয়াল ধরে পথের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে কাঠ, পাথর ও নানা জিনিসের তৈরি নানা রকমের পাত্র, মূর্তি ও জীবজন্তু ; আর দেওয়ালের উপর দিয়ে তাদের দেখা যাচ্ছে ?

একটা অদ্ভুত ছবি আমায় দেখালেন, আর এই গুহায় বন্দীর দলও কী অদ্ভুত।

ঠিক আমাদেরই মতো, না, তারা দেখছে তাদের নিজেরই ছায়া বা আগুনের আলোতে গুহার বিপরীত দেয়ালে যে-সব ছায়া পড়েছে, তাদের ?

সত্যি তাই ; মাথা কোনোদিকে ঘোরাতে না পারলে ছায়া ছাড়া আর কি তারা দেখতে পাবে ?

যে-সব জিনিস তারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের শুধু ছায়াই তো তারা দেখবে ?

নিশ্চয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাস্তবতা তাদের কাছে নিছক ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্লেটো—'রিপাব্লিক' (সপ্তম সর্গ)

****

প্রথম অধ্যায়

নির্বাণোন্মুখ সূর্য

(THE DYING SUN)

আলোর একটা গাঢ় আবরণ দিয়ে সূর্য পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে, এর বাইরে আর যে কিছু আছে তা আমাদের দেখতেই দেয় না। কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, তখন এই আলোর আচ্ছাদন সরে গিয়ে অন্ধকার ছেয়ে প্রকাশ পায় নক্ষত্রলোক। অগণিত তাদের সংখ্যা, আয়তনের মাত্রাভেদে কল্পনাকেও হার মানায়। শুধু দু'চারটি নক্ষত্রের খবর জানা গেছে আয়তনে যারা পৃথিবীর সমকক্ষ, কিন্তু বেশির ভাগই এত প্রকাণ্ড বড়ো•যে প্রত্যেকের দেহের ভিতর লক্ষ লক্ষ পৃথিবীকে অনায়াসে স্থান দিতে পারে। আবার এমন কয়েকটি অতিকায় দানব-নক্ষত্রের সন্ধান মিলেছে যারা পৃথিবীর চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়ো। পৃথিবীর সাগরতীরে সঞ্চিত বালুকারাশির মতোই, বিশ্বলোকের অন্তর্গত নক্ষত্রের সংখ্যা অপরিমেয়। বিশ্বের সম্মিলিত বস্তুসংঘের তুলনায়, দেশমাত্রায় সীমাবদ্ধ আমাদের এই পৃথিবী কতো ছোটো!

এই বিপুল সংখ্যক নক্ষত্র মহাশূন্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে; বেশির ভাগই একক যাত্রী, শুধু কয়েকটি চলেছে দলবদ্ধ হয়ে। অসীমের কাছ-ঘেঁষা এক বিরাট বিশ্বে এদের গতি, তাই পরস্পর কাছে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মহাসাগরের বুকে জাহাজের মতোই এরা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। নক্ষত্রকে জাহাজের সঙ্গে (সম পরিমাপে) তুলনা করলে দেখা যাবে যে, কোনো জাহাজ ও তার নিকটতম প্রতিবেশীর দূরত্বমাত্রা দশলক্ষ

মাইলেরও বেশি ; এর থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে কেন এরা পরস্পর খুব কাছাকাছি আসতে পারে না।

দূরত্বের ব্যবধান কোটি কোটি মাইল বলে নক্ষত্রদের কাছে আসা বা গায়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বিরল। কিন্তু কেউ কেউ অনুমান করেন যে, প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এরূপ দুঃসম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল। মহাশূন্যের পথে লক্ষ্যহীন যাত্রায়, একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র ভেসে এসেছিল তখনকার যুগের সূর্যের খুব কাছে। চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জলে যেমন জোয়ারের ঢেউ লাগে, ঐ নক্ষত্রের প্রবল টানে সূর্যের মধ্যেও জেগে উঠেছিল দীপ্তিমান বাষ্পপুঞ্জের এক ঢেউ। চাঁদের টানে, সমুদ্রপৃষ্ঠে জেগে-ওঠা ক্ষুদ্র ঢেউয়ের সঙ্গে এর সুদূর তুলনাও চলে না। কল্পনাতীত এক বিরাট বাষ্পের ঢেউ উঠেছিল সূর্যপৃষ্ঠে। বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী এই নক্ষত্র, সূর্যের যতই কাছে এগিয়ে এল ঐ ঢেউও ততই বড়ো হয়ে উঠল। ঢেউ, অতিমাত্রায় বেড়ে উঠলে ভেঙে পড়ে, অসংখ্য জলের কণা চারদিকে ছড়িয়ে দেয় ; তেমনি দ্বিতীয় নক্ষত্র দূরে সরে যাবার আগেই তার টান এত প্রবল হয়ে দাঁড়াল যে, বেড়ে উঠতে উঠতে, ঐ বিরাট ঢেউ টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। কিন্তু সেগুলি লোকসান হল না, তাদের প্রক্ষিপ্ত হওয়ার বেগ ও সূর্যের প্রবল টান, এই দুই সম্মিলিত বিরুদ্ধ শক্তির সামঞ্জস্য করে নিয়ে তখন থেকেই ঘুরতে শুরু করেছে সূর্যের চারদিকে। সেই ছোট বড়ো টুকরোগুলি থেকেই গ্রহলোকের উৎপত্তি, পৃথিবী তাদেরই মধ্যে একটি।

আকাশে, সূর্য ও যে-সব নক্ষত্র দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকেরই তাপমাত্রা অত্যধিক, উষ্ণতার বাড়াবাড়িতে জীব-লোকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অপঘাতের ধাক্কায়, সূর্য থেকে যে-সব টুকরো প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল, প্রথমে সেগুলিও ছিল খুবই উষ্ণ ; তারপর ক্রমশ আপন তেজ

ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হতে হতে বর্তমানে এদের তাপের সম্বল প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। যে-তেজ সূর্যরশ্মি থেকে এরা পায় তাই হল এদের তাপের একমাত্র সম্বল। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন, ক্রমশীতল একটি ক্ষুদ্র জড়কণাকে আশ্রয় করে, জানিনা কোথা থেকে, কখন, কেমন করে দেখা দিল এক অভিনব প্রাণের ধারা। অতি সাধারণ একটি জীবকোষের কণা থেকে তার আরম্ভ; নিজের অনুরূপ জীবনকে উৎপন্ন করা ও মৃত্যু, এরই মধ্যে ছিল তার মূলশক্তি সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সামান্য আরম্ভ থেকে এক বিস্ময়কর প্রাণের ধারা উদ্ভূত হয়েছে, যার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে ক্রমবর্ধমান জটিলতার দিকে এগিয়ে চলতে চলতে, পরিণতি লাভ করেছে এমন জীবে, যাদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে ভাবাবেগ, অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধ ও ধর্মকে কেন্দ্র করে; তাদের মহান আশা আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করছে তাদের ধর্মজীবন।

যদিও নিশ্চিত কিছু বলা চলে না, কিন্তু মনে হয় এমনি কোনো উপায়েই সৃষ্টি হয়েছে মানবজাতি। অণুতম বস্তুকণার মতো যে-পৃথিবী, তারই উপর দাঁড়িয়ে, দেশকালে সীমাবদ্ধ এই বিরাট বিশ্বলোকের মূল প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য আমরা জানতে চাই। উপলব্ধির প্রথম ধাপেই মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়; তার মূল কারণ—বিশ্বের চিন্তনাতীত বিরাট দূরত্ব, তার কল্পনাতীত বিপুল কালমাত্রা যার তুলনায় মানুষের ইতিহাস নিমেষমাত্র স্থায়ী, বিশ্ব-সংস্থিতিতে আমাদের একান্ত নিঃসঙ্গতা ও বিশ্বলোকের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ বস্তুসংঘের তুলনায় পৃথিবীর নিরতিশয় বস্তু-সূক্ষ্মতা। এই আতঙ্ক চরম সীমায় পৌঁছয় যখন দেখি এই বিশ্বব্যবস্থা জীবলোকের প্রতি উদাসীন; এর মধ্যে কোথাও মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা, কীর্তি, শিল্প ও ধর্মের স্থান নেই। বস্তুতঃ মনে হয়, এ যেন প্রাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মহাশূন্যের প্রায় সর্বত্র উষ্ণতা এত কম

যে প্রাণের পূর্ণ সমাধি ঘটবে, বেশির ভাগ জ্যোতিষ্কই এত উষ্ণ যে জীববাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। নানা জাতীয় তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে মহাশূন্যের পথে, জ্যোতিষ্কের সঙ্গে ঘটছে তাদের নিরন্তর সংঘাত, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই প্রাণের প্রতিকূল এমন কি প্রাণঘাতী।

ঠিক ভুল করে না হলেও, অন্তত একটা অপঘাতের পরিণামে আমরা হঠাৎ বিক্ষিপ্ত হয়েছি এমনি এক প্রতিকূল বিশ্বের প্রত্যন্ত দেশে। 'অপঘাত' শব্দটা প্রয়োগ করাতে, পৃথিবীর টিকে থাকার ব্যাপার নিয়ে, চমকে ওঠার কোনো কারণ নেই ; কারণ অপঘাত তো ঘটবেই, আর বিশ্ব যদি অনন্তকাল টিকে থাকে তাহলে সেই কালমাত্রায় চিন্তনীয় সব রকমের অপঘাত ঘটাই স্বাভাবিক। যতদূর মনে পড়ে, হাক্সলি বলেছেন যে ছ'টি বাঁদর, কিছু না বুঝে, যদি কোটি কোটি বছর ধরে একটানা টাইপ-রাইটার যন্ত্রের চাবিগুলি আঘাত করতে থাকে তাহলে ইংলণ্ডের যাদুঘরে যতগুলি বই আছে কালক্রমে সবই তারা লিখে ফেলতে পারবে। কোনো একটি বাঁদরের টাইপ-করা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় যদি দেখি, যে অন্ধভাবে যন্ত্র চালিয়েও, সে হঠাৎ শেক্সপিয়রের একটি সনেট টাইপ করে ফেলেছে, তাহলে একে অত্যাশ্চর্য আকস্মিক ঘটনা বলেই স্বীকার করতে হবে। আবার, কোটি কোটি বছরের চেষ্টায় বাঁদরগুলি যে কোটি কোটি পৃষ্ঠা টাইপ করেছে তাদের সবগুলি পরীক্ষা করলে, কোথাও না কোথাও, শেক্সপিয়রের একটি ছোট কবিতা নিশ্চিত পাওয়া যাবে। এই হল আকস্মিকতার অন্ধক্রিয়ার পরিণাম। এ-ভাবেই কোটি কোটি নক্ষত্রের, কোটি কোটি বছর ধরে মহাশূন্যের পথে ইতস্তত চলার ফলে, সব রকমের অপঘাতই ঘটবে ; নির্দিষ্ট সংখ্যক নক্ষত্র আবার এমন বিশেষ ধরণের দুর্ঘটনার এলাকায় গিয়ে ধরা পড়বে যা গ্রহলোক সৃষ্টির অনুকূল। কিন্তু হিসেব কষে দেখা গেছে, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর সংখ্যার অনুপাতে এই

বিশেষ ধরনের অপঘাত, সংখ্যায় অত্যন্ত বিরল; মোট কথা, গ্রহলোক সৃষ্ট এই বিশ্বে প্রায় অঘটনীয় ব্যাপার। কথাটা মনে রাখা দরকার, কারণ যে-রকম প্রাণীর সঙ্গে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়, তার উৎপত্তি একমাত্র পৃথিবীর মতো গ্রহেই সম্ভব। কতকগুলি অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সমাবেশ না হলে প্রাণের প্রকাশ অসম্ভব, তাদের মধ্যে প্রধান হল বিশেষ মাত্রার এক উষ্ণতা, যাতে পদার্থ তরল অবস্থায় থাকতে পারে।

তাপমাত্রার বাড়াবাড়িতে নক্ষত্রের দল এই পর্যায় থেকে বাদ পড়ে গেছে। এরা হল মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত অগ্নিবাষ্পের বিপুল সমাবেশ, যে-পরিবেষ্টন এদের উত্তাপের দান গ্রহণ করে তার উষ্ণতা উর্ধ্বমাত্রায় পরম-শূন্যাঙ্কের (Absolute Zero) চেয়ে চার ডিগ্রির বেশি নয় (ফারেন্‌হাইট পদ্ধতির হিমাঙ্কেরও ৪৮৪° নিচে)। আর ছায়াপথের বাইরে যে বিস্তৃত শূন্যপথ সেখানে এই তাপমাত্রা এর চেয়েও কম। এ-সব অগ্নিকুণ্ড থেকে দূরে অচিন্তনীয় শৈত্য, আর তাদের সন্নিকটে হাজার হাজার ডিগ্রির পরিমাপে উষ্ণতা, যে-উষ্ণতায় কঠিন পদার্থ গলে যায়, আর তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হয়।

এ-সব অগ্নিপিণ্ডকে ঘিরে, একটা নির্দিষ্ট দূরত্বমাত্রায় যে-সংকীর্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল রয়েছে, একমাত্র তারই মধ্যে প্রাণের প্রকাশ সম্ভব। এই পরিমণ্ডলীর বাইরে অপরিসীম ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে প্রাণলোকের ঘটবে সমাধি, আর এর ভিতরে দুঃসহ উত্তাপে জীবদেহ ঝল্‌সে কুঞ্চিত হয়ে উঠবে। মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে, যে-সব মণ্ডলীর ভিতর প্রাণের প্রকাশ সম্ভব, তাদের সমষ্টিগত বিস্তৃতি, সমগ্র মহাশূন্যের পরিব্যাপ্তির কোটি কোটি ভাগেরও কম। আবার এই মণ্ডলীর মধ্যেও প্রাণের আবির্ভাব অতি দুঃসম্ভব ঘটনা, কারণ যে-অপঘাতে সূর্য থেকে গ্রহলোক সৃষ্ট হয়েছে ঠিক তেমনি অপঘাত অন্য কোনো নক্ষত্রে ঘটা এতই

অসাধারণ ব্যাপার, যে এক লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে এমন একটি নক্ষত্র আছে কিনা সন্দেহ যাকে প্রদক্ষিণ করছে তারই দেহজাত এক গ্রহ, প্রাণ-প্রকাশের অনুকূল এক সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে।

শুধু এই কারণেই, একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না, যে প্রাণলোক সৃষ্টিই বিশ্বরচনার মূল উদ্দেশ্য ; যদি তাই হতো তাহলে এই বিরাট বিশ্বযন্ত্র ও তার উদ্ভূত ফলের পরিমাণের মধ্যে অনুপাতের সঙ্গতি নিশ্চিতই আরো বেশি আশা করা যেত। অন্তত প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় এই বিশ্বে প্রাণ যেন নিতান্ত গৌণ-পদার্থ ; যে-ভাবেই হোক জৈবপদার্থ, বিশ্ববিধানের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

শুধু কতকগুলি অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থাই প্রাণসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট কিনা, জানি না। কেউ কেউ অনুমান করেন যে সৃষ্টির পর, পৃথিবী ক্রমশ ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে তার মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব স্বাভাবিক, এমন কি অনিবার্য। আবার অনেকে মনে করেন যে এক বিশেষ দুর্ঘটনায় যেমন পৃথিবীর উৎপত্তি, তেমনি আর একটি দুর্ঘটনায় ঘটেছে প্রাণের প্রকাশ। জৈব-পদার্থের উপাদান সামগ্রী হল কতকগুলি অতি সাধারণ পরমাণু—যেমন অঙ্গার, ঝুল ও লণ্ঠনের কালিতে যার সন্ধান মেলে ; হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, যারা জলের মূল উপাদান এবং নাইট্রোজেন, যা বায়ুমণ্ডলের প্রধান অংশ। জীবসৃষ্টির উপযোগী সব রকমের পরমাণু এই নবজাত পৃথিবীর মধ্যেই ছিল। পরমাণুর যে-ব্যবস্থান আজ জীবকোষের ভিতর দেখতে পাই, সেই অতীত যুগে কখনও কখনও হয়তো একদল পরমাণু ঠিক এমনি ভাবেই শ্রেণীবদ্ধ হয়েছিল। বস্তুতঃ যথোপযুক্ত সময় দিলে ছ'টি বাঁদরের পক্ষে শেক্সপিয়রের একটি ছোট কবিতা টাইপ করে ফেলা যতটা নিশ্চিত, অনুরূপ সময় পেলে এই পরমাণুর দলেরও একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়া ঠিক ততটাই নিশ্চিত। এখন প্রশ্ন হল, এই নির্দিষ্ট বিন্যাসই

কি তাদের জীবকোষে পরিণত করবে! অর্থাৎ জীবকোষ কি শুধু সাধারণ পরমাণুদলের বিশিষ্ট সমাবেশ, না আরও কিছু বেশি? এ কি শুধু পরমাণুরই সমষ্টি, না পরমাণু ও প্রাণের সমন্বয়? ছেলেরা যেমন 'মেকানো'র সাহায্যে যন্ত্র তৈরি করে তাকে চালিয়ে দেয়, তেমনি কোনো নিপুণ রসায়নবিদ্ কি উপযুক্ত পরমাণুর সাহায্যে প্রাণশক্তির সৃষ্টি করতে পারেন? এ প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি, যখন মিলবে তখন তার থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে যে বিশ্বলোকের অন্যান্য জ্যোতিষ্কে আমাদের মতো প্রাণী আছে কি না, আর প্রাণের সম্যক্ তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ধারণাও তাতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হবে। গ্যালিলিওর জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ডারউইনের প্রাণতত্ত্ব মানবের চিন্তাধারায় যে-যুগান্তর এনেছে, এই প্রশ্নের মীমাংসা তার চেয়েও বৃহৎ বিপ্লবের সূচনা করবে।

একথা জানা গেছে, জৈবপদার্থ কতকগুলি অতি সাধারণ পরমাণুর সমষ্টি হলেও এ-সব পরমাণুর এমন এক বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে যাতে তারা একত্র দল বেঁধে অতি প্রকাণ্ড অণু গঠন করতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ পরমাণুই এই বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর মিলনে, হাইড্রোজেনের অণু (H_2 বা H_3), অক্সিজেন বা ওজোনের অণু (O_2 বা O_3), জল (H_2O) বা হাইড্রোজেন পারক্সাইডের (H_2O_2) অণু গঠিত হতে পারে। কিন্তু এ-সব যৌগিক পদার্থের কোনোটির মধ্যেই চারটির বেশি পরমাণু নেই। নাইট্রোজেনকে যোগ করলেও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না; হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যোগে যে-সব যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি তাদের মধ্যেও অণুগঠনকারী পরমাণুর সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এদের সঙ্গে অঙ্গার-পদার্থের সংযোগ হলেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে; হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও অঙ্গারপদার্থের পরমাণুর সম্মিলনে

শত, সহস্র, এমন কি দশসহস্র পরমাণু-সমন্বিত প্রকাণ্ড অণুর সৃষ্টি হয়। জৈবপদার্থ গঠিত হয় প্রধানতঃ এসব বৃহৎ অণুর সাহায্যে। একশো বছর আগেও মানুষের মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে কোনো এক অলৌকিক আত্মশক্তির (Vital force) প্রভাবেই বৃহৎ অণুর সংগঠন ও জীবদেহের অন্যান্য উপাদান পদার্থের সৃষ্টিকার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। যে-ইউরিয়ার {Urea—$CO(NH_2)_2$} সন্ধান জীবদেহে ছাড়া আর কোথাও মেলেনি, সেই ইউরিয়াই Wöhler সর্বপ্রথম তৈরি করলেন, তাঁর পরীক্ষাগারে, সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। কালক্রমে জীবদেহের অন্যান্য উপাদান পদার্থও এভাবে তৈরি হল। একদিন যে-ঘটনাবলীকে এক আত্মশক্তির উপর আরোপ করা হতো, আজ দেখতে পাই তাদের মূলে রয়েছে প্রাকৃতবিজ্ঞান ও রসায়নের সাধারণ প্রক্রিয়া। যদিও এ জটিল সমস্যার সম্যক্ সমাধান আজও কিছুই হয়নি, তবু এ-ধারণা ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে যে, জীবদেহের উপাদান পদার্থগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক পর্যায়ভুক্ত করেছে তার অঙ্গীভূত অতিসাধারণ মৌলিক পদার্থ অঙ্গার (Carbon) ; অন্য পরমাণুর সহযোগে এই অঙ্গার অতি প্রকাণ্ড অণু সৃষ্টি করতে পারে। এর মধ্যে অলৌকিক আত্মশক্তির কোথাও স্থান নেই।

একথা স্বীকার করলে বলতে হবে যে অঙ্গার পরমাণুর কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে বলেই বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব দেখতে পাই। ধাতু ও উপধাতুর মধ্যবর্তী স্থানে অঙ্গার, তার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যে, একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্তও অঙ্গার পরমাণুর গঠনরীতিতে এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি, যার সাহায্যে তার বিভিন্ন পরমাণুদলকে সম্মিলিত করার অদ্ভুত ক্ষমতার কোনো কারণ নির্দেশ করা যায়। অঙ্গার পরমাণুর অভ্যন্তরে রয়েছে এক কেন্দ্র-বস্তু, আর তাকে প্রদক্ষিণ করছে ছ'টি ইলেকট্রন, যেন সূর্যকে কেন্দ্র

করে ছ'টি গ্রহের প্রদক্ষিণ। মৌলিক পদার্থের তালিকায়, অঙ্গার পরমাণুর নিকটতম প্রতিবেশী বোরণ (Boron) ও নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তার একমাত্র প্রভেদ শুধু ইলেকট্রনের সংখ্যা নিয়ে ; এদের ইলেকট্রন-সংখ্যার চেয়ে অঙ্গার পরমাণুর ইলেকট্রন-সংখ্যা যথাক্রমে একটিমাত্র বেশি ও কম। তবু প্রাণ ও প্রাণহীনতার মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য, তার মূলে রয়েছে ইলেকট্রন-সংখ্যার এই সামান্য প্রভেদ। ছ'টি ইলেকট্রন-আশ্রিত পরমাণু কেন যে এই অভিনব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হল তার কারণ নিহিত রয়েছে প্রকৃতির মূল নিয়মাবলীর মধ্যে, কিন্তু গাণিতিক বিজ্ঞান আজ পর্যন্তও এ রহস্যের সন্ধান দিতে পারেনি।

রসায়নেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। চুম্বকধর্মের প্রাদুর্ভাব লোহাতে অত্যধিক, কিন্তু এর প্রতিবেশী কোবল্ট (Cobalt) ও নিকেলে (Nickel) তার মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। এদের পরমাণুতে যথাক্রমে ২৬, ২৭ ও ২৮টি ইলেকট্রন আছে ; অন্য সব পরমাণু এদের তুলনায় চুম্বকধর্মী নয় বললেই চলে। যদিও গাণিতিক বিজ্ঞান এ রহস্য ভেদ করতে পারেনি, তবু যে-ভাবেই হোক ২৬, ২৭ ও ২৮টি ইলেকট্রন-সম্বলিত পরমাণুর, বিশেষ করে প্রথমটির, অদ্ভুত গুণের উপর চুম্বকধর্ম নির্ভর করে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয়তা থেকে ; তুচ্ছ ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, ৮৩ থেকে আরম্ভ করে ৯২টি ইলেকট্রন-গঠিত পরমাণুতেই শুধু এই গুণ সীমাবদ্ধ। কিন্তু কেন, তা জানি না।

প্রাণকে চুম্বকধর্ম ও তেজস্ক্রিয়তার সমপর্যায়ভুক্ত করতে নির্দেশ দিচ্ছে রসায়ন। কতকগুলি অনিবার্য নিয়মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, ঠিক এ-ভাবেই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়মাবলীর নির্ধারণে কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন-সম্বলিত পরমাণু (যেমন, ৬, ২৬ থেকে ২৮ ও ৮৩ থেকে ৯২) এমন কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্মের অধিকারী হয়েছে, যার

প্রকাশ দেখতে পাই যথাক্রমে প্রাণ, চুম্বকধর্ম ও তেজস্ক্রিয়তা রূপে। সৃষ্টির মূলে যদি কোনো সর্বশক্তিমান স্রষ্টা থাকতেন, তাহলে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার নিয়মাবলীতে তিনি সীমাবদ্ধ হতেন না ; আপন ইচ্ছানুযায়ী তিনি এই বিশ্বকে এমন ভাবে গড়তে পারতেন যাতে অসংখ্য নিয়মাবলীর যে-কোনো একটি তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত। বিশ্বব্যবস্থা ভিন্ন রকমের হলে, অন্যান্য বিশিষ্ট পরমাণু হয়তো বিভিন্ন ধর্মের অধিকারী হতো। নিশ্চিত কিছু বলা চলে না, তবে যতদূর মনে হয় তেজস্ক্রিয়তা, চুম্বকধর্ম অথবা প্রাণ এদের কোনোটিরই আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল না। রসায়নের মতে, যে-বিশিষ্ট নিয়মাবলী বর্তমান বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করছে, চুম্বকধর্ম ও তেজস্ক্রিয়তার মতোই, প্রাণ হয়তো শুধু তাদেরই 'আকস্মিক অভিব্যক্তি।'

এই 'আকস্মিক' শব্দ প্রয়োগে হয়তো আপত্তি উঠতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে প্রাণের আবির্ভাব ঘটবে বলেই বিশ্বস্রষ্টা এক বিশিষ্ট নিয়মাবলী বেছে নিয়েছেন, তাতেই বা ক্ষতি কি। যদি বলি এই তাঁর প্রাণসৃষ্টির প্রকৃষ্ট পন্থা, তাতেই বা কি এসে যায়! যতক্ষণ সৃষ্টিকর্তাকে আমাদেরই মতো ভাবে ও উৎসাহে প্রদীপ্ত মানুষ বলে ভাবব, ততক্ষণ এই বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসা অসম্ভব ; তবে এটুকু হয়তো বলা চলে যে একবার এরূপ সৃষ্টিকর্তার অবতারণা করলে কোনো যুক্তির সাহায্যেই, যতটুকু পূর্বাহ্নে অনুমান করা হয়েছে, তার চেয়ে খুব বেশি এগিয়ে যাওয়া যাবে না। নরত্ববোধের (Anthropomorphism) সমস্ত চিহ্ন যদি মন থেকে মুছে ফেলা যায়, তাহলে বর্তমান নিয়মাবলী, কেবলমাত্র প্রাণসৃষ্টির জন্যেই নির্ধারিত হয়েছিল, এরূপ অনুমান করার কোনো সঙ্গত কারণ থাকে না। চুম্বকধর্ম ও তেজস্ক্রিয়তার প্রকাশে এই নিয়মাবলীর নির্বাচন যতটা সম্ভব, প্রাণসৃষ্টি সম্বন্ধেও ঠিক তাই ;

পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনার দাবী বরং একটু বেশি, কারণ বিশ্বে প্রাকৃতবিজ্ঞানের ভূমিকার তুলনায় জীবতত্ত্বের ভূমিকা নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-কর। একমাত্র বাস্তবতাকেই যুক্তির মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করলে, প্রাণ যে নিতান্ত তুচ্ছ গৌণপদার্থ এই তথ্য মন থেকে এ-ধারণা হয়তো অনেকখানি দূরীভূত করবে যে কোনো বিশেষ আগ্রহ নিয়ে মহান বিশ্বশিল্পী প্রাণের সৃষ্টি করেননি।

একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বুঝবার হয়তো আর একটু সুবিধা হতে পারে। গ্রন্থি বাঁধতে অভ্যস্ত কোনো নির্বোধ নাবিক হয়তো ভাবতে পারে যে এই বিদ্যেটা জানা না থাকলে সমুদ্র অতিক্রম করা অসম্ভব হতো। গ্রন্থিবাঁধা ব্যাপারটা দেশমাত্রার (Space) শুধু তিনমাত্রায় (Three dimensions) সীমাবদ্ধ, কোনো গ্রন্থিই ১, ২, ৩, ৪, ৫ বা অন্য কোনো মাত্রায় বাঁধা চলে না। এর থেকে নির্বোধ নাবিক হয়তো এই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে যে নাবিক-জাতি হল মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্তার বিশেষ অনুগৃহীত, আর বিশ্বসৃষ্টিতে গ্রন্থিবাঁধা ও সমুদ্র অতিক্রম করা যাতে সম্ভব হয় তারই জন্যে তিনি দেশকে করেছেন ত্রিমাত্রিক। অর্থাৎ নাবিকের জন্যেই দেশকে ত্রিমাত্রিক করতে হয়েছে। উপরোক্ত এই যুক্তি প্রায় সমপর্যায়ের ; কারণ প্রাণ ও গ্রন্থিবাঁধার ব্যাপার অনেকটা একই পর্যায়ের, যেহেতু এরা উভয়েই জড়-বিশ্বের ব্যাপক কর্মধারার এক অতি নগণ্য অংশমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান থেকে আমাদের অভিনব সৃষ্টিরহস্যের কথা যতদূর জানা গেছে তার সম্বন্ধে এখানেই দাঁড়ি কাটতে হল। সৃষ্টির মূলকে অতিক্রম করে আমাদের অস্তিত্বের চরম উদ্দেশ্য যখনই উপলব্ধি করতে যাই, বা নিয়তির ভাণ্ডারে মানবজাতির ভাগ্যে কী সঞ্চিত রয়েছে পূর্বদৃষ্টি দিয়ে যখনই তার আভাস পেতে চাই, বিস্ময় ততই বেড়ে চলে।

যে-ধরনের জীবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তারা বেঁচে থাকতে পারে শুধু উপযুক্ত আলো ও উত্তাপের পরিবেশে। সূর্য থেকে উপযুক্ত পরিমাণ তেজ পৃথিবী গ্রহণ করে বলেই আমরা বেঁচে আছি; বাড়তি বা কমতি যে-কোনো দিকে এই সাম্যস্থিতির অভাব ঘটলেই পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব লোপ পাবে। মূলকথা হচ্ছে, অতি সহজেই এই সাম্যের অভাব ঘটে।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলবাসী পৃথিবীর আদিম মানব, তার বাসস্থানের উপর তুষার-যুগের আবির্ভাবে, আতঙ্কে বিহ্বল হতো; প্রতি বছর তুষার-নদী নেমে আসত উপত্যকার দিকে, প্রতি শীতঋতুতে প্রাণধারণের উপযোগী সূর্যতাপ আসত কমে। ঠিক আমাদেরই মতো, তার কাছেও বিশ্ব ছিল প্রাণের প্রতিকূল।

পরবর্তী যুগের মানুষ আমরা, সূর্যকে পরিবেষ্টন করা এক সংকীর্ণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে বাস করে ও সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে, দেখতে পাই এক পৃথক তুষার-যুগের ভ্রূকুটি। সমস্ত দেহ হ্রদের জলে নিমজ্জিত থাকা সত্বেও ট্যান্‌টেলাস্‌কে (Tantalus) যেমন তৃষ্ণায় প্রাণ দিতে হয়েছিল, সমগ্র মানব-জাতিরও ঠিক তেমনি দুর্ভাগ্য যে দুঃসহ ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে হয়তো তার অস্তিত্ব লোপ পাবে, অথচ বিশ্বের অধিকাংশ বস্তু তখনও রয়ে যাবে এক প্রাণঘাতী অসহনীয় উষ্ণতায়। তেজের ভাণ্ডার বাইরে থেকে পূর্ণ হবার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সূর্যের প্রাণসঞ্চারী তেজের সম্বল ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসবে; আর তাকে ঘিরে, মহাশূন্যের যে-নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব, ধীরে ধীরে তাও সংকুচিত হয়ে আসবে। তখনও প্রাণপ্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র হয়ে থাকতে হলে পৃথিবীকে ক্রমাগত ঐ নির্বাণোন্মুখ সূর্যের সন্নিকটে আসতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে, কাছে আসা তো

দূরের কথা, গতিবিদ্যার অমোঘ নিয়মাবলী তাকে নিয়ত ঠেলে নিয়ে চলেছে সূর্য থেকে দূরে দূরান্তরে, বিশ্বের এক ঘন অন্ধকারময় তুষার শীতল প্রদেশে। যতদূর দেখতে পাই পৃথিবীর এই বহির্গতি থাকবে অব্যাহত, যতদিন না ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে প্রাণলোকের ঘটবে পূর্ণ-সমাধি—অবশ্য এর পূর্বেই যদি না কোনো খণ্ডপ্রলয় বা সংঘাত প্রাণের আশু পরিসমাপ্তি ঘটায়। এই চরম পরিণতি একমাত্র পৃথিবীর ভাগ্য-বৈশিষ্ট্য নয়; বিশ্বের সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডলী, আমাদের সূর্যেরই মতো, একদিন তাদের তেজের সম্বল নিঃশেষ করে দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করবে, আর তাদের অনুচর গ্রহলোকে যদি কোথাও প্রাণের প্রকাশ ঘটে থাকে তারও পরিসমাপ্তি হবে, ঠিক এমনি অগৌরবে।

পদার্থবিদ্যাও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত সমর্থন করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য বাদ দিলেও, সাধারণ প্রাকৃত সূত্র—তাপবলবিদ্যা (Thermodynamics) এর দ্বিতীয় নিয়ম, এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করে যে তাপমৃত্যুই (Heat-death) হল বিশ্বজগতের একমাত্র পরিণতি, যাতে তার তেজসম্বল সর্বত্র সমভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তার সমগ্র বস্তুসংঘ সমউষ্ণতায় এসে পৌছবে। এই উষ্ণতার মাত্রা এত কম যে তাতে প্রাণের প্রকাশ অসম্ভব। কোন নির্দিষ্ট পথ এই চরম অবস্থায় এনে পৌছে দেবে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়; সব পথ 'রোম নগরীতে এসে শেষ হয়েছে,' অর্থাৎ যে-কোনো পথ ধরেই যাত্রা শুরু হোক না কেন লক্ষ্যস্থল মাত্র একটি—এই মহাযাত্রার শেষ হবে অনিবার্য সর্বব্যাপী মহানির্বাণে।

এই কি তাহলে প্রাণলোকের চরম পরিণতি—যে-বিশ্বব্যবস্থায় প্রাণের কোনো স্থান নেই, যা প্রাণের নিতান্ত পরিপন্থী বা সর্বতোভাবে তার প্রতি উদাসীন, তারই মধ্যে যেন ভুল করে আশ্রয় নিয়ে পদে পদে শুধু প্রতিহত হওয়া! জমাট বেঁধে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্রাদপি

ক্ষুদ্র এক বস্তুকণাকে আশ্রয় করে থাকা! মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার চরম সমাধি ঘটবে, ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে তার সমস্ত কীর্তি, এই বিশ্বে সে যে কোনো দিন ছিল তার কোনো চিহ্নই রেখে যেতে পারবে না, এ-সব কথা নিশ্চিত জেনেও পৃথিবীর মতো ক্ষুদ্র এক রঙ্গমঞ্চে অতি ক্ষুদ্র কালমাত্রায় মহাসমারোহে তার জীবনযাত্রা নির্বাহ করা!

জ্যোতির্বিজ্ঞান এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, কিন্তু আমার মনে হয় এর জবাব মিলবে পদার্থবিজ্ঞান থেকে। কারণ বিশ্বের বর্তমান সংস্থিতি, দেশমাত্রার বিরাটত্ব ও শূন্যতা এবং আমাদের অকিঞ্চিৎকরতার খবরই জ্যোতির্বিজ্ঞান দিতে পারে; এমন কি, কালের যাত্রায় যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার কিছু আভাসও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেতে হলে পদার্থের মূল প্রকৃতির গভীর রহস্য ভেদ করতে হবে। কিন্তু সে হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে; বরং দেখা যাবে এই অনুসন্ধিৎসা আমাদের আধুনিক প্রাকৃত বিজ্ঞানের অন্তরতম প্রদেশে নিয়ে গেছে।

****

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিনব বিজ্ঞানজগৎ

(THE NEW WORLD OF MODERN PHYSICS)

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আদিম যুগে মানুষের কাছে প্রকৃতি ছিল একান্ত বিস্ময়কর ও জটিল। বাঁধন মুক্ত বস্তুমাত্রই নিচের দিকে পড়ে ; জলে পাথর ফেললে তা ডুবে যায়, কিন্তু কাঠ ভেসে থাকে, এ-সব অতি-সাধারণ ঘটনার পুনরাবর্তন সে অসংকোচে মেনে নিত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত জটিল ঘটনাবলীর মধ্যে এরূপ সমতা ছিল না—বনের মধ্যে, একটি গাছে হয়তো বাজ পড়তো, অথচ আকৃতি ও বৃদ্ধিতে ঠিক তারই সমান পাশের গাছটি থাকত অক্ষত ; এক অমাবস্যায় আবহাওয়া হতো ভালো, ঠিক তার পরের অমাবস্যাতে হতো তার বিপরীত।

নিজেরই মতো অকারণে চঞ্চল এই বিশ্বপ্রকৃতির সংস্পর্শে এসে মানুষ তার প্রথম ভাবাবেগে, প্রকৃতিকে রূপ দিতে চেয়েছিল ঠিক তার নিজেরই ছাঁচে। বিশ্বের যে-সব ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে তার কাছে বিশৃংখল বলে মনে হতো, তাদের সে আরোপ করত কোনো ভগবান কিংবা অনুকূল বা প্রতিকূল অতিমানবিক শক্তির খেয়ালের উপর। প্রত্যেক ঘটনার মূলে যে একটা কারণ আছে এই উপলব্ধি তার মনে জেগেছিল বহু পর্যবেক্ষণের পর। কালক্রমে এই 'কার্যকারণবাদ' সমগ্র জড়প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে ; সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোনো 'কারণ', সব সময় ঠিক একই 'ফল' প্রদর্শন করে। কোনো এক কালমাত্রায় যে-ঘটনা সংঘটিত হয় তা বাইরের কোনো অতিপ্রাকৃত প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না,

পূর্ববর্তী মুহূর্তের কতকগুলি অবস্থাই তাকে অমোঘসূত্রে বেঁধে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার এই অবস্থাগুলি নির্ণীত হয় তাদের পূর্ববর্তী কতকগুলি অবস্থা দিয়ে ; এ-ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে পৃথিবী যে-অবস্থায় ছিল, তার পরবর্তী সমগ্র ঘটনাবলীর ধারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়েছে সেই আদ্য অবস্থা দিয়ে। একবার এই প্রাথমিক অবস্থা নিশ্চিতভাবে জানা গেলে বলা যায় যে, এক অপরিবর্তনীয় পথে, প্রকৃতি এক পূর্বনির্ধারিত পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সংক্ষেপে বলা চলে, সৃষ্টি-ক্রিয়া কেবলমাত্র বিশ্বসৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ হয়নি, তার ভবিষ্যৎ ইতিহাসও রচনা করে রেখেছে। আগে মানুষ বিশ্বাস করতো যে নিজের ইচ্ছায় সে ঘটনাবলীর ধারা পরিবর্তিত করতে সক্ষম ; সেই ধারণার মূলে তার কোনো যুক্তি, বৈজ্ঞানিক মননশক্তি বা অভিজ্ঞতা ছিল না, শুধু তার সহজ প্রবৃত্তি তাকে সেই পথে চালিত করেছে। কিন্তু যে-সব ঘটনাকে পূর্বে সে অতিপ্রাকৃত প্রাণীর প্রভাবের উপর আরোপ করত, এখন থেকে তাদের ছেড়ে দিল কার্যকারণবাদের হাতে।

যাকে গ্যালিলিও ও নিউটনের যুগ বলা হয় সেই সপ্তদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হল, প্রকৃতিতে পথনির্দেশক হিসেবে কার্যকারণবাদের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা। তখন প্রমাণ হল, আকাশের ভৌতিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি আলোকের ধর্ম থেকে ; ধূমকেতুর আবির্ভাবে সাম্রাজ্যের পতন বা রাজার মৃত্যু সূচিত হয় ব'লে যে-ধারণা এতকাল বদ্ধমূল ছিল, জানা গেল তাদের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী। তাই নিউটন বলেছিলেন, অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মূল কারণ যান্ত্রিক নিয়ম থেকেই নির্ধারিত হবে।

সমগ্র জড়বিশ্বকে একটা বিরাট যন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করার এক প্রবল আন্দোলনের এর থেকেই সূত্রপাত ; উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই

আন্দোলনের বেগ চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছল। সে সময় জার্মান বিজ্ঞানী হেলম্‌হোলৎস্ (Helmhottz) প্রচার করলেন যে সমস্ত প্রাকৃত বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য বলবিদ্যায় বিভক্ত হওয়া ; লর্ড কেলভিন বলেছেন, যার কোনো যান্ত্রিক অনুকৃতি গড়ে তোলা যায় না তা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর মতোই তিনি স্থপতিশিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ; চেষ্টা করলে আরো অনেকেই এরূপ হতে পারতেন। তখন স্থপতি-বিজ্ঞানীর যুগ, তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র প্রকৃতির কতকগুলি যান্ত্রিক অনুকৃতি সৃষ্টি করা। ওয়াটারস্টন ম্যাক্সওয়েল ও আরো অনেক বিজ্ঞানী বায়বকে যন্ত্রধর্মী কল্পনা করে তার ধর্মগুলি অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে, এই যন্ত্র গঠিত হয়েছে অতি ক্ষুদ্র ও মসৃণ অসংখ্য গোলকের সমষ্টি দিয়ে ; কঠিনতম ইস্পাতের চেয়েও এরা কঠিন, বন্দুকের গুলির মতো দ্রুত এদের গতি। বায়বের চাপ সৃষ্টি হয় এ-সব দ্রুতগামী গোলকের সংঘাতে ; হিমশিলার বর্ষণে তাঁবুর ছাদে যেমন চাপ পড়ে, এই চাপও অনেকটা সেই রকম। এই ক্ষুদ্র গোলকগুলিকে বাহন করেই বায়বের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চালিত হয়। তরল ও কঠিন পদার্থের ধর্ম এ-ভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা আশানুরূপ সফল হলেন না ; আলো ও মহাকর্ষের ক্ষেত্রে এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হল। বিশ্বের ঘটনাবলী যে শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিক নিয়মেরই অধীন, এই অকৃতার্থতাও তাঁদের সেই দৃঢ়বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল করতে পারল না। তাঁদের এ-ধারণা রয়েই গেল যে প্রবলতর চেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত এই সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই যে সমগ্র জড়প্রকৃতি একটি নিখুঁত যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানবজীবনের ব্যাখ্যার উপরও এ-সব ধারণার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া শুরু হল। কার্যকারণবাদ যতই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল ও প্রাকৃতিক

ঘটনাবলী যতই যান্ত্রিক নিয়মের অন্তর্ভূত হতে লাগল, 'স্বাধীন ইচ্ছার' প্রতি বিশ্বাস রাখা ততই কঠিন হয়ে উঠল। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি কার্যকারণবাদের অধীন হলে প্রাণের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? এ-সব যুক্তি থেকেই সূত্রপাত হল, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর নিয়মিক-সিদ্ধান্তের (Mechanistic Philosophy); এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠল ভাব-দর্শন (Idealistic Philosophy)। সমগ্র জড়জগৎ একটা বিরাট যন্ত্র, নিয়মিক-সিদ্ধান্তের এই মূল তথ্য বিজ্ঞান সমর্থন করল; কিন্তু ভাব-দর্শনের সমর্থকরা প্রচার করলেন যে জড়জগৎ মননশক্তি থেকে উদ্ভূত, কাজেই মননশক্তি দ্বারা গঠিত। পরস্পর বিরোধী এই দুই মতবাদ প্রায় এক শতাব্দী ধরে মানুষের চিন্তাধারাকে বিপরীত দিকে নিয়ে চলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও, বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রাণকে জড়প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা 'বিশিষ্ট-কিছু' ব'লে মনে করা হতো। তারপর হল এক অভিনব আবিষ্কার— প্রাণশক্তির আধার যে-জীবকোষ, দেখা গেল জড়বস্তুর মতো তাদেরও মূল উপাদান রাসায়নিক পরমাণু; আর সম্ভবত একই প্রাকৃতিক নিয়মাবলী জড় ও জৈব পরমাণুকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর থেকেই একটা প্রশ্ন উঠল, মানুষের দেহ ও মস্তিষ্ক গঠনকারী পরমাণুর দল কার্যকারণসম্বন্ধ মেনে চলবে না কেন। শুধু অনুমান নয়, অনেকেরই দৃঢ় ধারণা হল যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রাণশক্তির প্রকৃতি যান্ত্রিক বলেই প্রতিপন্ন হবে। কাজেই বলা যেতে পারে যে নিউটন, বাক (Bach) বা মিকেলএঞ্জেলোর মনের সঙ্গে ছাপাখানা, বাঁশি বা বাষ্পীয় করাতের পার্থক্য শুধু জটিলতায়; বাইরের উদ্দীপনার আঘাতে যথাযথ সাড়া দেওয়াই এদের মূল ধর্ম। এই ধর্মের ভিতর স্বাধীন-ইচ্ছা ও নির্বাচনের কোনো স্থান নেই ব'লে নীতির সমস্ত ভিত্তি অপসারিত হল। রাম শ্যামের

পার্থক্য তাদের নিজের ইচ্ছায় ঘটেনি, পৃথক হওয়া ছাড়া তাদের উপায় নেই ; বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রভাবে তাদের আচরণ পৃথক হতে বাধ্য।

এই শতাব্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় এক আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। যে-সব বস্তুকণা সোজাসুজি সহজ বোধের শক্তিতে ধরা দেয়, পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু তাদেরই মধ্যে। তাঁদের পরীক্ষাধীন ক্ষুদ্রতম বস্তুকণাও কোটি কোটি অণুর সমষ্টি। এরূপ আয়তনের জড়কণার আচরণ নিঃসন্দেহে যান্ত্রিক নিয়মের অধীন, কিন্তু তা ব'লে একথা জোর করে বলা চলে না যে একটিমাত্র অণুর ব্যবহারও এই নিয়মের শাসন মেনে চলবে। একথা আশা করি সকলেরই জানা আছে যে জনতার সমষ্টিগত আচরণ ও তার প্রত্যেকটি লোকের স্বতন্ত্র আচরণে বিপুল পার্থক্য রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সর্বপ্রথম অণু, পরমাণু ও ইলেকট্রনের স্বতন্ত্র ব্যবহার পরীক্ষা করা সম্ভব হল ; সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও আবিষ্কার হল যে কতকগুলি ব্যাপারের, বিশেষ করে তেজ ও মহাকর্ষের, কোনো যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। নিউটনের চিন্তাধারা, বাকের ভাবাবেগ বা মিকেল-এঞ্জেলোর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে এমন যন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব কিনা, এই নিয়ে যখন দার্শনিকেরা আলোচনায় প্রবৃত্ত, তখন বিজ্ঞানীমহলে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হল যে আলো ও মহাকর্ষ সৃষ্টি করতে পারে এমন যন্ত্র তৈরি করা অসম্ভব। তারপর এই শতাব্দীর শেষ মাসে বার্লিনের অধ্যাপক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বিকিরণের এমন কতকগুলি ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করেন যাদের কোনো মীমাংসাই এর পূর্বে সম্ভব হয়নি। তাঁর ব্যাখ্যার ধারা শুধু যে যান্ত্রিক-প্রকৃতি বহির্ভূত তা নয়, এমন কি কোনো যান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করাও অসম্ভব ব'লে মনে হতো। বিশেষ করে এই জন্যেই

তার বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল, এমন কি তাকে উপহাসও করা হতো। কিন্তু এর আশ্চর্য সফলতা পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, অবশেষে গড়ে উঠল বর্তমান 'কণিকাবাদ' (Quantum Theory), নব-বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণকারী এক সূত্র। তখন ঠিক বোঝা না গেলেও, কণিকাবাদের অভ্যুত্থানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক যুগের অবসান ও এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচিত হল।

ঘড়ির কাঁটার মতো, বিচ্ছিন্ন-গতির পথে, প্রকৃতির কর্মধারা প্রবাহিত; প্রথম অবস্থাতে প্ল্যাঙ্কের মতবাদ এর চেয়ে বেশি কিছু নির্দেশ দিতে পারেনি। গতি নিরবচ্ছিন্ন না হলেও, ঘড়ির চরম প্রকৃতি একেবারে যান্ত্রিক ও কার্যকারণ সম্বন্ধের সম্পূর্ণ অধীন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন যে প্ল্যাঙ্কের কণিকাবাদ, অন্তত প্রথম দৃষ্টিতেই, নিছক বিচ্ছিন্নতার চেয়ে অত্যধিক বিপ্লবসূচনাকারী পরিণামের আভাস দেয়। যে-কার্যকারণ-বাদ প্রাকৃত জগতের ধারা নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি বলে এতদিন স্বীকৃত হয়েছিল, এই নূতন মতবাদ তাকে আসনচ্যুত করলো। পূর্ববর্তী বিজ্ঞান একথাই নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেছে যে প্রকৃতির পথ শুধু একটি, যা কার্যকারণের নিরবচ্ছিন্ন ধারাতে সুনির্দিষ্ট; কালের যাত্রায়, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, এই অপরিবর্তনীয় পথই তার একমাত্র সুনির্বাচিত পথ। 'ক' অবস্থা থেকে 'খ' অবস্থায় পরিণতি অনিবার্য। কিন্তু নববিজ্ঞান শুধু একথা বলতে সক্ষম যে 'ক' অবস্থা থেকে 'খ' বা 'গ' বা 'ঘ' বা অন্য অসংখ্য অবস্থায় পরিণতির সম্ভাবনা রয়েছে; আর 'গ' এর চেয়ে 'খ' এর সম্ভাবনা বেশি, 'ঘ'এর চেয়ে 'গ'এর সম্ভাবনা বেশি, ইত্যাদি। এমন কি 'খ', 'গ' ও 'ঘ' অবস্থার আপেক্ষিক সম্ভাবনাও নির্দেশ করা যায়। শুধু সম্ভাবনার সীমানায় নিবদ্ধ ব'লে নববিজ্ঞান নিশ্চিতরূপে পূর্বসিদ্ধান্ত করতে পারে না, কোন অবস্থা থেকে কোন অবস্থায় পরিণতি ঘটবেই; এ হল ভগবানের হাত, অবশ্য ভগবান ব'লে যদি কিছু থেকে থাকে।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। জানা গেছে, রেডিয়ম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু স্বতঃবিস্ফোরণে রূপান্তরিত হয় সীসে ও হিলিয়ম পরমাণুতে; তাই এক টুকরো রেডিয়মের বস্তুমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে, পরিবর্তে সৃষ্টি হয় সীসে ও হিলিয়ম। যে-নিয়মে এই কমতির হার নিয়ন্ত্রিত হয় তা পরম বিস্ময়কর—জন্ম বন্ধ থেকে যদি একটানা মৃত্যু চলতে থাকে (বয়সের প্রশ্ন বাদ দিয়ে যে-মৃত্যুর হার প্রত্যেকের পক্ষে সমান) তাহলে যে-পরিমাণে লোকসংখ্যা কমতে থাকবে, রেডিয়মের পরিমাণও ঠিক সেই মাত্রাতেই হ্রাস হতে থাকে। সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে একদল সৈন্যের উপর যথেচ্ছ গুলি বর্ষণ চলতে থাকলে তাদের সংখ্যা যে-ভাবে কমতে থাকবে, রেডিয়মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। নবীন প্রবীণে সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে এ যেন ভাগ্যপরীক্ষার খেলা, গুলির আঘাতে কখন কার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে কেউ বলতে পারে না, বয়সের বিবেচনার কোনো প্রশ্নই এক্ষেত্রে ওঠে না। মোটকথা, রেডিয়ম পরমাণুর বিস্ফোরণের সঙ্গে তার বয়সের কোনো সম্বন্ধ নেই; তার ধ্বংসের কারণ বার্ধক্য নয়, কোনো উপায়ে নিয়তি তাকে ঠেলে নিয়ে যায় মৃত্যুর মুখে। বিজ্ঞানে ভাগ্যপরীক্ষার স্থান নেই, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপারের কোনো সঙ্গত কারণ আজ পর্যন্তও খুঁজে পাওয়া যায়নি ব'লে পরমাণুর বিস্ফোরণকে এক অন্ধ নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে —সেই পরমাণুই লোপ পাবে নিয়তির তাড়নায় যে ভাঙনের সীমানায় এসে পৌঁছবে।

মনে করা যাক, কোনো ঘরে দুহাজার রেডিয়ম পরমাণু আছে। বিজ্ঞান বলতে পারে না এক বছর পরে এদের মধ্যে ক'টি পরমাণু টিকে থাকবে; ২০০০, ১৯৯৯, ১৯৯৮ ইত্যাদি সংখ্যার আপেক্ষিক সম্ভাবনাই সে শুধু নির্দেশ করতে পারে। বস্তুতঃ সব চেয়ে বেশি সম্ভাবনা হল ১৯৯৯

সংখ্যাটির। দুহাজার পরমাণুর মধ্যে কেবলমাত্র একটিরই ভাঙার সম্ভাবনা।

জানি না, কেমন করে দুহাজার পরমাণু থেকে এই নির্দিষ্ট পরমাণুটি অপঘাতের জন্যে নির্বাচিত হয়। প্রথমত একথাই মনে হতে পারে যে-পরমাণু অত্যধিক বিক্ষুব্ধ হয় বা সব চেয়ে বেশি উত্তপ্ত স্থানে গিয়ে পৌছয় তারই ভাঙার পালা। কিন্তু তা হতে পারে না, কারণ আঘাত বা উত্তাপ যদি একটি পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে তাহলে তাদের প্রভাবে বাকি ১৯৯৯টি পরমাণুরও বিস্ফোরণ ঘটা সম্ভব ছিল, আর কেবলমাত্র চাপ ও তাপের প্রভাবে রেডিয়মের বিস্ফোরণ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা যেত। কিন্তু প্রত্যেক বিজ্ঞানীই একথা অসম্ভব বলে মনে করেন, কারণ পরীক্ষায় দেখা গেছে বাইরের অবস্থার কোনো তারতম্যই বিস্ফোরণের মাত্রা ও রূপ এতটুকু পরিবর্তন করতে পারে না ; বরং এ-ধারণাই তাঁরা পোষণ করেন যে প্রতিবছর দুহাজার পরমাণুর মধ্যে একটিমাত্র পরমাণুই ভাগ্যের তাড়নায় বিস্ফোরণের গণ্ডীতে এসে ধরা পড়ে। এই হল, ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে রাদারফোর্ড ও সডি প্রবর্তিত, স্বতঃ বিস্ফোরণের (Spontaneous disintegration) মূল নিয়ম।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা কিছু আশ্চর্য নয় ; প্রকৃতির যে-সব ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত বলে মনে হয়, হয়তো ভবিষ্যতে একদিন পূর্ণতর জ্ঞানের আলোকে দেখা যাবে অনিবার্য কার্যকারণ সম্বন্ধই তাদের মূল ভিত্তি। সাধারণ জীবন যাত্রায় 'সম্ভাবনা' শব্দের প্রয়োগ করলেই বোঝা যায় যে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার এখনও অসম্পূর্ণ। আমরা হয়তো ব'লে থাকি কাল বৃষ্টি হওয়ার 'সম্ভাবনা' আছে ; কিন্তু আবহাওয়াবিদ্ জোর করে বলতে পারেন যে বৃষ্টি 'হবেই,' কারণ তিনি জানেন যে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে অত্যধিক নিম্ন চাপমাত্রায় এক

বায়ুপ্রবাহ পূর্বদিকে ধাবিত হয়েছে। কোনো ঘোড়ায় চড়ে আমরা হয়তো তার অস্বাভাবিক চলনের কথা ব'লে থাকি, কিন্তু ঘোড়ার মালিক জানে যে তার ঘোড়ার একটা পা ভাঙা। তাই, সম্ভাবনার প্রতি নব্যবিজ্ঞানের পক্ষপাতিত্ব প্রকৃতির আসল কর্মতন্ত্র সম্বন্ধে তার অজ্ঞতাকে শুধু চাপা দিয়ে রাখতে পারে।

একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে কি করে এটা সম্ভব হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ম্যাকলিনান রাদারফোর্ড ও আরো অনেক বিজ্ঞানী, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এক নূতন বিকিরণ-রশ্মির সন্ধান পান; কঠিন পদার্থ ভেদ করার অত্যধিক ক্ষমতাই এই রশ্মির বৈশিষ্ট্য। সাধারণ আলো অস্বচ্ছ পদার্থকে এক ইঞ্চির এক সামান্য অংশ মাত্র ভেদ করতে পারে; এক টুকরো কাগজ বা তার চেয়েও পাতলা কোনো ধাতুর পাতের সাহায্যে সূর্যের আলোকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রাখা যায়। র‍্যণ্টগেন রশ্মির বস্তুভেদ করার ক্ষমতা আরো অনেক বেশি; আমাদের হাত, এমন কি সমস্ত শরীর এই রশ্মি ভেদ করতে পারে, তাই অস্ত্র চিকিৎসক আমাদের হাড়ের আলোক-চিত্র গ্রহণ করতে সক্ষম। একটি মুদ্রার মতো স্থূল ধাতুর পাত একে সম্পূর্ণ আটক করে। কিন্তু ম্যাকলিনান-রাদারফোর্ড আবিষ্কৃত এই অভিনব রশ্মি, সীসে বা অন্য ঘন ধাতুকে কয়েক গজ পর্যন্ত ভেদ করতে পারে।

এখন জানা গেছে, 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic Radiation) ব'লে খ্যাত এই নূতন রশ্মির বেশির ভাগই আসে বাইরের মহাশূন্য থেকে, প্রচুর পরিমাণে এসে আঘাত করে পৃথিবীর উপর, ধ্বংস সাধনে অপরিসীম তার ক্ষমতা। প্রতি সেকেণ্ডে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যেক ঘন ইঞ্চিতে প্রায় কুড়িটি পরমাণু এর আঘাতে ভেঙে পড়ে, আমাদের দেহের কোটি কোটি পরমাণু মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে এরূপ অনুমান করেন যে এই

রশ্মিই হয়তো জীবাণুকোষকে (Germplasm) আঘাত করে, আধুনিক বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) সম্মত আকস্মিক জৈব পরিবর্তন সাধন করে থাকে। হয়তো বা মহাজাগতিক রশ্মিই বাঁদরকে মানুষে পরিবর্তিত করেছে।

এককালে এরূপ অনুমান করা হতো এই রশ্মির বর্ষণই তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিস্ফোরণের মূল কারণ। ভাগ্যনিয়ন্তার মতো এর আবির্ভাব ও পরমাণুকে ইতস্তত আঘাত করার ফলে যথেচ্ছ গুলি বর্ষণাধীন সৈন্যের মতোই, পরমাণুর অস্তিত্ব লোপ পেতে থাকে। যে-হারে পরমাণু ধ্বংস হয় তার নিয়ম এর থেকেই নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থকে কয়লার খনির নিচে নিয়ে এই অনুমানকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ব'লে প্রতিপন্ন করা হল; খনির নিচে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েও এর বিস্ফোরণের হারে এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না।

এই মতবাদের অবসান হলেও অনেক বিজ্ঞানী এই আশা পোষণ করেন যে তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণে নিয়তির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এমন কোনো প্রাকৃতিক শক্তির সন্ধান হয়তো ভবিষ্যতে মিলতে পারে। পরমাণু ধ্বংসের হার নিশ্চিতই এই শক্তির মাত্রার অনুপাতে হবে। কিন্তু অনুরূপ আরো অনেক ঘটনা গভীর জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

এদের মধ্যে জানা-ঘটনা হল বিজলিবাতি থেকে আলোক বিকিরণ প্রক্রিয়া। বিজলিবাতির সরু তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত হলে তারটা অতিমাত্রায় গরম হয়ে উঠে আলো ছড়িয়ে দেয়; মূল ব্যাপারটা হল, সরু তারটা ডাইনামো থেকে বিদ্যুৎশক্তি গ্রহণ করে, তারপর তাপ ও আলোরূপে তাকে ছড়িয়ে দেয়। তারের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর ইলেকট্রন আপন আপন কক্ষ পথে ঘুরছে, প্রতি মুহূর্তে বহু ইলেকট্রন থেকে থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কক্ষ বদল করছে; এই

প্রক্রিয়ায় কখনও বা তারা তেজ বিকীর্ণ করছে, আবার কখনও তেজ শোষণ করছে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন এ-সব লাফের সংখ্যাতত্ত্ব হিসেব করে দেখলেন যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকীর্ণ তেজ ও তারের উত্তাপের তাড়নাই ইলেকট্রনের লাফিয়ে কক্ষ বদল করার মূল কারণ। কিন্তু হিসেবে গরমিল ধরা পড়ল, বিজলিবাতির সমগ্র তেজের পরিমাণ ও তেজ-তাপের তাড়নায় কক্ষচ্যুত ইলেকট্রনদলের বিকীর্ণ তেজমাত্রায় সামঞ্জস্যের অভাব দেখা গেল। তেজমাত্রার এই ভেদ দেখে তিনি স্থির করলেন যে পরমাণু থেকে অন্য কোনো উপায়ে আরো তেজ ছড়িয়ে পড়ছে, অর্থাৎ তেজ ও উত্তাপের তাড়না ছাড়া আপনা থেকেই কোনো কোনো ইলেকট্রন কক্ষ ত্যাগ করছে ; রেডিয়ম পরমাণুর স্বতঃ বিস্ফোরণের মতোই এ-সব ইলেকট্রনের ব্যবহার। মোটকথা, এ-ক্ষেত্রেও সেই প্রচ্ছন্ন নিয়তিকেই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। কোনো সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তি যদি এই নিয়তির ভূমিকা গ্রহণ করে থাকত তাহলে তার মাত্রাভেদে সরু তার থেকে বিকীর্ণ তেজের মাত্রায়ও, অনুরূপ ভেদ দেখা যেত। কিন্তু যতদূর জানা গেছে, বিকিরণের মাত্রা নির্ভর করে শুধু প্রকৃতির কতকগুলি অভেদ রাশির উপর ; এই রাশি অপরিবর্তনীয়, পৃথিবীই হোক আর দূরতম নক্ষত্রই হোক কোথাও এদের এতটুকু অসঙ্গতি আজ পর্যন্তও দেখা যায়নি। বহিঃশক্তির অবতারণার কোনো স্থান এর মধ্যে নেই।

তেজস্ক্রিয় স্বতঃ বিস্ফোরণ বা আপনা থেকে ইলেকট্রনের হঠাৎ কক্ষত্যাগ, এই দুই ঘটনার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে যদি পরমাণুকে আমরা এমন চারজন তাশ খেলোয়াড়ের সঙ্গে তুলনা করি, যারা প্রত্যেকেই একরঙা তেরখানা তাশ হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই খেলা ভেঙে উঠে পড়বে ব'লে চুক্তিবদ্ধ। চারজন মিলে গঠন-করা এরূপ কোটি কোটি তাশের দল যে-ঘরে বসেছে তাকে খানিকটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব'লে

ধরে নেওয়া যাক। দলের মধ্যে তাশ ভাগ করে দেবার আগে প্রত্যেকবারই যদি তাশগুলি খুব ভালো করে ওলট-পালট করে দেওয়া হয়, তাহলে একরঙা তাশ পেয়ে, পূর্বসর্ত অনুযায়ী, যতগুলি দল খেলা বন্ধ করবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে ঠিক তেজস্ক্রিয়তার মূলসূত্র অনুসারে। যদি খুব ভালো করে তাশগুলিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কালক্রম ও অতীতের উপর খেলাভাঙার ব্যাপারটা মোটেই নির্ভর করবে না, কারণ তাশ মিশিয়ে দেওয়াতে প্রত্যেকবারই সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়। তাই যে-হারে খেলোয়াড় দলের হ্রাস ঘটবে তা অপরিবর্তনীয়, রেডিয়ম পরমাণুর বিস্ফোরণের মতোই। কিন্তু প্রত্যেকবার খেলা হবার পর, কোনোরকম ওলট-পালট না করে তাশগুলি যদি ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে কোন খেলোয়াড়ের হাতে কোন তাশ যাবে তা নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হবে, ভাগ করার অব্যবহিত পূর্বে তাশগুলির যে ক্রমিক ব্যবস্থান ছিল শুধু তারই উপর। অর্থাৎ এই ব্যাপারটা কার্যকারণ নিয়মের অধীন হবে। এ-ক্ষেত্রে যে-হারে খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমতে থাকবে, তা তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু ভাঙার হার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তেজস্ক্রিয়তার সূত্র অনুযায়ী খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমাতে হলে তাশগুলিকে ক্রমাগত ওলট-পালট করে দিতে হবে, এই বিধানের যিনি নিয়ন্তা তাঁরই নাম দেওয়া হয়েছে নিয়তি বা ভাগ্য (Fate)। এই নিয়তি সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান না থাকলেও একথা সম্ভব ব'লে মনে হয় যে কার্যকারণসম্বন্ধের কঠিন অনিবার্যতাকে প্রশমিত করতে প্রকৃতির ভিতর একটা অজ্ঞাতপূর্ব শক্তি বর্তমান ; নিয়তি বা ভাগ্য ছাড়া এর আর কোনো উপযুক্ত সংজ্ঞা আজ পর্যন্তও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র অতীত অবস্থাই ভবিষ্যৎকে অপরিবর্তনীয় রূপে নিয়ন্ত্রিত করবে একথা এখন আর তেমন জোর করে বলা চলে না ; অন্তত আংশিক ভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, ভবিষ্যৎ

এক অজ্ঞাত 'ভাগ্যবিধাতার' উপর নির্ভর করে ব'লেই মনে হয়। আরো অনেক তথ্য এই মতই সমর্থন করে। যেমন অধ্যাপক হাইসেনবার্গ প্রমাণ করেছেন যে আধুনিক 'কণিকাবাদের' মূলতথ্য এক 'অনির্দেশ্যবাদের' (Principle of Indeterminacy) সঙ্গে জড়িত। বহুদিন থেকে মানুষের মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে প্রকৃতির কাজের ধারা একেবারে নিখুঁত। মানুষের তৈরি যন্ত্রের কাজ নিখুঁতও নয়, নির্ভুলও নয়, কিন্তু এ বিশ্বাস তার ছিল যে পরমাণুর অন্তর্নিহিত কর্মপদ্ধতি হবে পরম নিখুঁত ও নির্ভুল ধারার প্রতীক। কিন্তু হাইসেনবার্গ প্রমাণ করে দিলেন নিখুঁত ও নির্ভুল কাজকে প্রকৃতি বরং এড়িয়েই চলে।

পূর্ববর্তী বিজ্ঞান একথাই বলে যে, কোনো এক মুহূর্তে কোনো বস্তুকণার, যেমন ইলেকট্রনের, স্থিতি ও গতি ঠিক একই সঙ্গে জানতে পারলে তার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা যায়; ইলেকট্রনের স্থিতি, গতি ও তার উপর ক্রিয়াশীল নির্দিষ্ট বহিঃশক্তিই তার সমগ্র ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বের সব বস্তুকণা সম্বন্ধে এই তিনটি তথ্য জানা থাকলে তার ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিও হিসেব করে ব'লে দেওয়া যায়।

কিন্তু হাইসেনবার্গের এই অভিনব আলোচনা থেকে প্রথম খবর পাওয়া গেল যে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি একই সঙ্গে জানা অসম্ভব। কোনো এক মুহূর্তে ইলেকট্রনের স্থিতি জানা থাকলে সেই মুহূর্তে তার গতি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। প্রকৃতির অন্তর্ব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট 'ভুলের গণ্ডী' (Margin of Error) রয়েছে; এই গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে নিখুঁত মাপজোকের সন্ধান করতে গেলে সে-চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। যে-ভুলের সীমায় প্রকৃতি নিজেই আবদ্ধ তার ভিতরকার কোনো নিশ্চিত খবর দেওয়া প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। আবার ইলেকট্রনের গতি নিশ্চিতরূপে জানলে সেই মুহূর্তে তার স্থিতি জানা যায় না, তার স্থিতি ও গতি

যেন কোনো ম্যাজিক-লণ্ঠনের কাঁচের বিপরীত পৃষ্ঠে অবস্থিত। কোনো খারাপ লণ্ঠনের মধ্যে এই কাঁচ রাখলে তার উভয় পৃষ্ঠের মাঝামাঝি অংশকে কেন্দ্রীভূত করে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি একই সঙ্গে মোটামুটি দেখা সম্ভব। কিন্তু উৎকৃষ্ট লণ্ঠনের সাহায্যে তা সম্ভব হবে না, যে-পৃষ্ঠে স্থিতি তাকে যতই পরিষ্কার দেখাতে চেষ্টা করা হবে বিপরীত পৃষ্ঠে অবস্থিত গতি ততই ঝাপসা হয়ে আসবে।

পূর্ববর্তী বিজ্ঞান এই খারাপ লণ্ঠনের সঙ্গে তুলনীয়। এই বিজ্ঞান আমাদের মনে এই ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি করেছিল যে উৎকৃষ্ট লণ্ঠন অর্থাৎ সূক্ষ্মতম যন্ত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তার সাহায্যে কোনো এক মুহূর্তে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যাবে। এই ভ্রান্তিই বিজ্ঞানে নির্দেশ্যবাদের (Determinism) প্রবর্তক। কিন্তু নব্যবিজ্ঞান হল উৎকৃষ্ট লণ্ঠনের সঙ্গে তুলনীয়, এর সাহায্যে জানা গেল যে ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি বাস্তবের দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থিত; দুটিকে একত্র নিখুঁত ভাবে পরিস্ফুট করা অসম্ভব, অর্থাৎ একটিকে জানলে অপরটি অনিশ্চিত থেকে যায়। এ-ভাবেই নব্যবিজ্ঞান নির্দেশ্যবাদের মূল ভিত্তির উপর আঘাত করল।

আর একটি উপমা দেওয়া যাক—মনে হয় বিশ্বযন্ত্রের সন্ধিকেন্দ্রগুলি যেন কোনো রকমে 'শিথিল' হয়ে গেছে, ক্ষয়প্রাপ্ত পুরানো ইঞ্জিনের মতো তার বিভিন্ন অংশ যেন খানিকটা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই উপমা ভ্রান্তির সৃষ্টি করবে যদি এর থেকে মনে করা হয় যে বিশ্ব নিখুঁত নয় বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। পুরানো ইঞ্জিনে তার 'সন্ধিকেন্দ্রের শিথিলতার' মাত্রা সর্বত্র সমান নয়, স্থানভেদে মাত্রাভেদ হয়; কিন্তু প্রাকৃত জগতে এই শিথিলতার মাত্রা নির্ধারিত হয় প্ল্যাঙ্কের ধ্রুব ও রহস্যময় রাশি 'h' দিয়ে। বিশ্বের সর্বত্র এই রাশির পরম সমতা পরিলক্ষিত হয়। কী পরীক্ষাগারে কী নক্ষত্রে, নানা উপায়ে এর মান নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও এর

এতটুকু ভেদ ঘটতে দেখা যায়নি। 'সন্ধিশিথিলতা', তা সে যে-কোনো ধরনের হোক না কেন, সে যে বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এই তথ্যই কার্যকারণবাদের সমাধি ঘটিয়েছে, কারণ কার্যকারণসম্বন্ধই নিখুঁত যন্ত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

যে-অনির্দেশ্যতার কথা হাইসেনবার্গ বলেছেন তা, সম্পূর্ণ না হলেও, আংশিকভাবে আত্মগত প্রকৃতির (Subjective-Nature) ইলেকট্রনের স্থিতি ও গতি যে একেবারে নিখুঁতভাবে নির্দেশ করা যায় না, তা কতকটা নির্ভর করে ব্যবহৃত যন্ত্রের নিকৃষ্টতার উপর—যেমন এক পাউণ্ডের চেয়ে ছোট ওজন না থাকলে তাদের সাহায্যে কেউ তার নিজের নিখুঁত ওজন বের করতে পারে না। বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রতম 'একক' (Unit) হল ইলেকট্রন, কাজেই এর চেয়ে ছোটো কোনো এককই বিজ্ঞানীর আয়ত্তাধীন নয়। বস্তুত এই এককের নির্দিষ্ট মাত্রাই অসুবিধা সৃষ্টির মুখ্য কারণ নয়; প্ল্যাঙ্কের কণিকাবাদ নির্ধারিত রহস্যময় একক 'h'ই এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। যে-ঝটকানো গতিতে (Jerks) প্রকৃতি এক সুনিয়ন্ত্রিত পথে চলেছে তার মাত্রা নির্দিষ্ট হয় এই 'h' রাশি দিয়ে। যে-তুলাদণ্ডের গতি 'ঝটকানো' তার সাহায্যে যেমন নিখুঁতভাবে ওজন করা অসম্ভব তেমনি এই 'ঝটকার' মাত্রা নির্দিষ্ট থাকা পর্যন্ত বিজ্ঞানে নিখুঁত পরিমাপও অসম্ভব।

এই আত্মগত অনির্দেশ্যতার সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তা ও বিকিরণের প্রশ্নাবলীর কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রকৃতিতে আরও অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যাদের কোনো সুসম্বদ্ধ ধারার অন্তর্ভূত করতে হলে যে-ভাবেই হোক কোথাও, অনির্দেশ্যতার অবতারণা করতে হবে। পরে দেখা যাবে (পৃষ্ঠা ৮৯), এ-সব যুক্তির বলেই অনেক বিজ্ঞানী অনুমান করতে বাধ্য হয়েছেন, যে-প্রক্রিয়ায় মুক্ত পরমাণু ও ইলেকট্রন জড়িত তা সম্পূর্ণ অনির্দেশ্য, আর বৃহৎ

পরিমাপের ঘটনাবলীতে যে আপাত নির্দেশ্যতা বর্তমান তা শুধু সংখ্যা-তত্ত্বের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। ডিরাক্ (Dirac) এই অবস্থার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন—

নির্দিষ্ট অবস্থায় স্থিত কোনো পরমাণুকে পরীক্ষা করলে তার ফল সাধারণত নির্দেশ্য হবে না, অর্থাৎ কোনোরূপ অবস্থা বৈষম্য না ঘটিয়ে এই পরীক্ষা যদি কয়েকবার ধরে চলতে থাকে তাহলে লব্ধফলের পার্থক্য ঘটতে পারে। বহুবার যদি একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ফল, যতবার পরীক্ষা করা হয়েছে, তার এক নির্দিষ্ট ভগ্নাংশরূপে পাওয়া যায়। কাজেই একথা বলা চলে, যখনই এই পরীক্ষা করা হবে তখনই এই বিশিষ্ট ফল পাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সম্ভাবনা থাকবে। গাণিতিক নিয়মের সাহায্যে এই সম্ভাবনা হিসেব করা যায়। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনার মান যখন হয় ১, তখন সেই পরীক্ষার লব্ধফল হয় সম্পূর্ণ নির্দেশ্য।

অর্থাৎ ভিড়ের মধ্যে পরমাণু ও ইলেকট্রনকে পরীক্ষা করলে তার লব্ধফলে নির্দেশ্যতা আরোপ করে স্থূলগণনার (Average) গাণিতিক নিয়ম, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলী এ-ক্ষেত্রে অচল।

বৃহত্তর বস্তুজগতে, অনুরূপ ঘটনার সাহায্যে, এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি পয়সাকে ঘুরিয়ে উপর দিকে ছুঁড়ে দিলে তা 'চিৎ' কিংবা 'উপুড়' হয়ে মাটিতে এসে ঠেকবে, পড়ার আগেই সেকথা নিশ্চিত বলে দিতে পারি এমন জ্ঞান আমাদের নেই। কিন্তু দশ লক্ষ মন ওজনের পয়সা একসঙ্গে উপর দিকে ছুঁড়লে দেখা যাবে পাঁচ লক্ষ মন 'উপুড়', ও পাঁচ লক্ষ মন 'চিৎ' হয়ে পড়েছে। যতবারই এই পরীক্ষা করা হোক না কেন, ঠিক একই ফল পাওয়া যাবে। একেই প্রকৃতির সমতার (uniformity) প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও এক প্রচ্ছন্ন কার্যকারণবাদের দৃষ্টান্ত ব'লে হঠাৎ মনে হতে

পারে ; বস্তুত এ হল শুধু সম্ভাবনার গাণিতিক নিয়ম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। কিন্তু পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাধীন ক্ষুদ্রতম বস্তুকণার মধ্যে যে-বিপুল-সংখ্যক পরমাণু রয়েছে তার তুলনায় দশ লক্ষ মন ওজনের পয়সার সংখ্যা অতি নগণ্য। এখন সহজেই বোঝা যাচ্ছে কি করে নির্দেশ্যতার ভ্রান্তধারণা —যদি ভ্রান্তধারণাই একে বলা যায়—বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে।

এ-সব প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজ পর্যন্তও অসম্পূর্ণ রয়েছে। একদল পদার্থবিজ্ঞানী (যদিও এঁদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে ব'লে মনে হয়), এখনও এরূপ আশা করেন যে পরিণামে কোনো উপায়ে কার্যকারণবাদই প্রাকৃত জগতে তার পূর্ব আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ধারা তাঁদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে। যাই হোক, যে-বিশ্বছবি নব্যবিজ্ঞান আমাদের কাছে তুলে ধরেছে তাতে কার্যকারণ-বাদের কোথাও স্থান নেই ; ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে পুরানো যন্ত্রছবি থেকে এই ছবিতে প্রাণ ও চৈতন্য, আর তাদের সহচর স্বাধীন-ইচ্ছা ও মানুষের উপস্থিতি দ্বারা বিশ্বকে ক্ষুদ্রমাত্রায় ভিন্নরূপ প্রতিপন্ন করার ক্ষমতার স্থান হয়েছে অনেক ব্যাপক। কারণ, যা-কিছু আমরা জানি, বা নব্যবিজ্ঞান যা-কিছু এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিক, আমাদের মস্তিষ্কের পরমাণুতে যে ভগবান নিয়তির ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে হয়তো আমাদেরই মন। এ-সব পরমাণুকে বাহন করেই হয়তো আমাদের মন শরীরের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, আর তাতে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাও সম্ভব। আজ আর বিজ্ঞান এই 'সম্ভাবনাকে' অগ্রাহ্য করতে পারে না ; স্বাধীন-ইচ্ছার উপর আমাদের সহজাত বিশ্বাসের (innate conviction) ভিত্তিকে শিথিল করতে এখন আর এমন কোনো যুক্তি সে প্রয়োগ করে না যা অমীমাংসেয়। পরন্তু, নির্দেশ্যতা বা কার্যকারণসম্বন্ধের অবর্তমানতার তাৎপর্য কি হতে পারে, এ সম্বন্ধে সে

কোনো আভাসই দেয় না। বাইরের উদ্দীপনার আঘাতে প্রকৃতি ও মানুষ যদি একান্তভাবে সাড়া না দেয়, তাহলে ঘটনাবলীর ধারা নির্ধারিত হবে কী দিয়ে? যদি তাই হয়, বাধ্য হয়ে আমাদের নির্দেশ্যতা ও কার্যকারণ-বাদে ফিরে যেতে হবে; আর তা যদি না হয়, জানি না কেমন করে এই বিশ্বে কোনো কিছু ঘটতে পারে।

আমার মনে হয়, সময়ের মূলপ্রকৃতি (True nature of time) সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত এ-সব প্রশ্নের নিশ্চিত মীমাংসা করা সম্ভব নয়। একটানা গতিতে সময় কেন বয়ে যায়, প্রকৃতির বর্তমান মূল নিয়মাবলী তার কোনো কারণ নির্দেশ করতে পারে না; সময় নিশ্চল বা পিছন দিকে চলছে এমন সম্ভাবনাও এই নিয়মাবলী অস্বীকার করে না। সময়ের একটানা অগ্রগতি হল কার্যকারণসম্বন্ধের মূল ভিত্তি, আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়েই তাকে আমরা প্রকৃতির নির্ধারিত নিয়মাবলীর উপর আরোপ করে থাকি। জানি না সময়ের সহজাত ধর্মের সঙ্গে তার কোনো যোগসূত্র আছে কি না, যদিও অচিরেই দেখা যাবে আপেক্ষিকবাদ (Theory of Relativity), সময়ের অগ্রগতি ও কার্যকারণসম্বন্ধকে নিছক ভ্রান্তি ব'লে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। আপেক্ষিকবাদের মতে সময়কে গণ্য করা হয় 'দেশের' (space) তিনমাত্রায় অতিরিক্ত এক চতুর্থ মাত্রা (a fourth dimension) ব'লে; কাজেই কালমাত্রায় সংঘটিত ঘটনাবলীর পারম্পর্য ও দেশমাত্রায় অবস্থিত প্রশস্ত রাজপথের উপর টেলিগ্রাফ পোস্টের পারম্পর্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না, 'অনুক্রম' (Sequence) ও 'পরিণামের' (Consequence) ভেদ যায় মিলিয়ে।

যে-অমীমাংসিত দুরূহ সমস্যা কালের মূল প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাই প্রতিপদে অবরুদ্ধ করছে মানুষের চিন্তাধারাকে। বিশ্বসৃষ্টিতে 'কাল' যদি এমন এক আদি পদার্থ হয়ে থাকে, যার মূলপ্রকৃতি কোনোদিনই

আমাদের আয়ত্তগম্য হবে না, তাহলে নির্দেশ্যতা ও স্বাধীন-ইচ্ছার যুগব্যাপী দ্বন্দ্ব চিরদিনই অমীমাংসিত থেকে যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান থেকে নির্দেশ্যতা ও কার্যকারণবাদের নির্বাসন সম্ভাবনা কণিকাবাদের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়। বিকিরণের ক্ষেত্রে কতকগুলি ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করাই ছিল কণিকাবাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ; কিন্তু বর্তমান সমস্যার সম্যক ধারণা করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে নিউটন ও সপ্তদশ শতাব্দীর যুগে।

সাধারণ পর্যবেক্ষণে আলোকরশ্মি সম্বন্ধে এই তথ্যই জানা যায় যে তার গতি সরলরেখা ধরে ; ধুলো ভর্তি ঘরে সূর্যরশ্মি যে সরলরেখায় চলে তা আশা করি সকলেরই জানা আছে। দ্রুতগামী বস্তুকণাও সরলরেখা ধরে চলতে চায়, তাই তখনকার যুগের বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই আলোকরশ্মিকে ধরে নিয়েছিলেন আলোকের উৎস থেকে প্রক্ষিপ্ত বস্তুকণা ব'লেই— অনেকটা বন্দুকের গুলি বর্ষণের মতো। নিউটনও এই মত সমর্থন করেন, 'আলোকের কণাবাদ' (Corpuscular Theory of Light) তাঁরই হাতে চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

কিন্তু আলো যে সব সময়ে সরলরেখা ধরে চলে না এ-তথ্যও জানা গেছে। আয়নার উপর থেকে প্রতিফলিত হলে হঠাৎ এর দিক পরিবর্তন ঘটে, জল বা অন্য কোনো তরল পদার্থে আপতিত হলে প্রতিসৃত হয়ে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। আলোকের প্রতিসরণ প্রক্রিয়ার জন্যেই, নৌকার দাঁড় যেখানে জলে প্রবেশ করে ঠিক সেখানেই ভাঙা ব'লে মনে হয়, আর নদীর আপাত গভীরতা তার আসল গভীরতার চেয়ে কম দেখায়। যে-নিয়মাবলী এ-সব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে নিউটনের সময়েও তারা সুপরিচিত ছিল। প্রতিফলনের ক্ষেত্রে, আলোকরশ্মি প্রতিফলকের উপর যে-কোণে (Angle) আপতিত হয়, প্রতিফলিত রশ্মিও ঠিক সেই কোণেই প্রতি-

ফলক ত্যাগ করে ; অর্থাৎ আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণ মাত্রায় একেবারে সমান। কঠিন টেনিস-মাঠ থেকে টেনিস-বল যে-ভাবে লাফিয়ে ওঠে, আলোকরশ্মিও প্রতিফলক থেকে ঠিক সেইভাবেই প্রক্ষিপ্ত হয়। প্রতিসরণের ক্ষেত্রে, আপতন-কোণের জ্যা (Sine) ও প্রতিসরণ-কোণের জ্যা এক ধ্রুব-অনুপাতে (Constant Ratio) জড়িত। প্রতিফলক ও প্রতিসরকের উপরিতলে আলো-কণা কতকগুলি নির্দিষ্ট শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হলে এই নিয়মাবলী মেনে চলবে, এ-তথ্য প্রমাণ করতে নিউটনকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। নিউটন যে-প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থ (Principia) লিখে গেছেন তার ৯৪ ও ৯৬ সম্পাদ্য এখানে দেওয়া হল—

৯৪ সম্পাদ্য

যদি দুটি অনুরূপ মাধ্যমের (similar mediums) অন্তর্বর্তী স্থান উভয়দিকেই সমান্তরাল ক্ষেত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, আর কোনো বস্তুপদার্থ সেই স্থানের ভিতর দিয়ে চলার পথে, অন্য কোনো শক্তির প্রভাবে প্রতিহত বা আন্দোলিত না হয়ে, এই মাধ্যম দুটির যে-কোনো একটির দিকে সোজা আকৃষ্ট বা চালিত হয় ও উভয় মাধ্যম থেকে সমান দূরে এই আকর্ষণ শক্তির মাত্রা যদি সর্বত্র সমান হয়, তাহলে আমি বলি— উভয় ক্ষেত্রের যে-কোনো একটির উপর এই পদার্থের গতিরেখার আপতন-কোণের জ্যা ও অপর ক্ষেত্র থেকে তার বহির্গমন-কোণের জ্যা, এক নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হবে।

৯৬ সম্পাদ্য

অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করা হলে, আর পদার্থের মাধ্যমে প্রবেশ করার পূর্বে গতি তার পরবর্তী গতির চেয়ে বেশি হলে বলব, যে আপতন-রেখা (line of incidence) যদি ক্রমাগত মাধ্যমতল দিকে নত

(inclined) হতে থাকে তাহলে এমন এক সময় আসবে যখন এই পদার্থ ঐ মাধ্যমতল থেকে প্রতিফলিত হবে ; তখন আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণে কোনো ভেদ থাকবে না।

আলোকরশ্মি জলের উপর আপতিত হলে আংশিক ভাবে তার প্রতিসরণ হয় এই তথ্যই নিউটনের কণাবাদের সমাধি ঘটালো। আপতিত রশ্মির কিছুটা হয় প্রতিসৃত, আর বাকিটা হয় প্রতিফলিত ; এই প্রতিফলিত রশ্মি থেকেই সৃষ্টি হয় সাধারণ প্রতিবিম্ব ও সমুদ্রের উপর চাঁদের আলোর তরঙ্গ। নিউটনের মতবাদ এই প্রতিফলনের কোনো সঙ্গত হেতু নির্দেশ করতে পারল না—কারণ, আলো বস্তুকণার সমষ্টি হলে জলের উপরিতলে ক্রিয়াশীল শক্তি প্রত্যেকটি বস্তুকণাকেই সমভাবে প্রভাবান্বিত করবে ; একটি কণা প্রতিসৃত হলে বাকি সবই সেই পথ অনুসরণ করবে, চন্দ্র-সূর্য বা নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত করার কোনো ক্ষমতাই জলের থাকবে না। 'পরিচালন ও প্রতিফলনের একান্তর খেয়াল' (Alternate fits of transmission and reflection) জলতলের উপর আরোপ করে নিউটন এই বাধা দূর করার চেষ্টা করলেন—কোনো এক মুহূর্তে আপতিত একটি বস্তুকণাকে সে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়, কিন্তু ঠিক পরবর্তী মুহূর্তেই তার সঙ্গীটির প্রবেশপথ রুদ্ধ করে তাকে প্রতিফলিত আলোরূপে ফিরিয়ে দেয়। আধুনিক কণিকাবাদ প্রকৃতির সমতাকে ত্যাগ করেছে, সম্ভাবনাকে অধিষ্ঠিত করেছে নির্দেশ্যতার আসনে, এ-সব তথ্য কণাবাদ থেকে অদ্ভুত ও আশ্চর্য ভাবে পূর্বাহ্নেই অনুমেয় ; কিন্তু এই মতবাদ সেই যুগে কারও মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

তা ছাড়া, কণাবাদকে আরো অনেক জটিল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সূক্ষ্ম ও বিশদ পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, আলো এমন নিখুঁত সরল-রেখা ধরে চলে না যার থেকে মনে করা যায় বস্তুকণার গতির সঙ্গে তার

সাদৃশ্য আছে। বৃহৎ পরিমাপের বস্তু, যেমন বাড়ি বা পাহাড়, সূর্যের আলোকে আড়াল করে ব'লে তাদের নির্দিষ্ট ছায়া পড়ে; গুলি বর্ষণের মতোই সূর্যের আলোর বর্ষণ থেকে এরা আমাদের রক্ষা করে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র বস্তু, যেমন সরু তার, চুল বা সুতো, এদের কোনো ছায়া পড়ে না; পর্দার সামনে ধরলে তার কোনো অংশই অনালোকিত থাকে না। যে-কোনো উপায়েই হোক আলো, সরল পথ ছেড়ে, এদের ধার ঘেঁষে বেঁকে চলে যায়; নির্দিষ্ট ছায়ার পরিবর্তে সৃষ্টি হয়, পর পর সজ্জিত কতকগুলি সমান্তরাল উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল দাগের। এদের বলা হয় 'ব্যতিকরণ-রেখা' (Interference Bands)। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—কোনো পর্দার উপর গোলাকার বড়ো ফুটোর মধ্য দিয়ে গোলাকার আলোকস্তম্ভ বাইরে বেরিয়ে আসে; কিন্তু এই ফুটো যদি সব চেয়ে ছোটো ছুঁচের ফুটোর মতো হয় তাহলে তাকে অতিক্রম করে এসে যে-আলো বিপরীত দিকে রক্ষিত পর্দায় পড়ে তাতে ক্ষুদ্র আলোকবৃত্তের পরিবর্তে সৃষ্টি হয় বৃহত্তর ও পর পর সজ্জিত উজ্জ্বল ও কালো অনেকগুলি এককেন্দ্রিক বৃত্ত। এদের নাম 'অপবর্তন-বৃত্ত' বা 'বিক্ষেপণ-বৃত্ত' (Diffraction Rings)। আলোক-রশ্মিকে পিনের ফুটোর ভিতর দিয়ে পার করে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে; পর পর সাজানো এই বৃত্তগুলি দেখানো হয়েছে ২নং প্লেটের ১ম ছবিতে। কেন্দ্র থেকে এই বৃত্তাকার ফুটোর ব্যাসার্ধের বাইরে যে-আলো এসে পড়েছে তা কোনো উপায়ে বেঁকে এসেছে এই ফুটোর কিনারা ঘেঁষে।

কঠিন পদার্থ আলো-কণাকে (Light-Corpuscles) আকর্ষণ করে, এ-সব ঘটনা তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব'লে নিউটন মেনে নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

হাওয়ার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে আলোকরশ্মি যখন কোনো স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ পদার্থের কোণ বা সূক্ষ্মপ্রান্ত (যেমন মুদ্রা, ছুরি, ভাঙা পাথর বা কাঁচের বৃত্তাকার বা সমকৌণিক প্রান্ত) ঘেঁষে চলে তখন তা সরলপথ ছেড়ে একটু বেঁকে যায়, মনে হয় যেন এই পদার্থ তাকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নিয়েছে। যে-সব রশ্মি এই সূক্ষ্মপ্রান্তের সব চেয়ে বেশি কাছে আসে তাদের গতিপথও সব চেয়ে বেশি বেঁকে যায়, যেন তাদের উপরই আকর্ষণ সব চেয়ে বেশি।

এ-ক্ষেত্রেও নিউটন ও নব্যবিজ্ঞানের চিন্তাধারার আশ্চর্য মিল রয়েছে, নিউটন কল্পিত আকর্ষণ শক্তি ও আধুনিক তরঙ্গ বলবিদ্যার 'কণিকা-শক্তির' (Quantum forces) খুব নিকট সাদৃশ্য। কিন্তু 'অপবর্তন' তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করতে সফল না হওয়ায় এই আকর্ষণ শক্তির কথা কেউ স্বীকার করেনি।

কালক্রমে এ-সব ও অনুরূপ অনেক ঘটনার যথাযথ ব্যাখা করা সম্ভব হল আলোকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ঢেউয়ের সমষ্টি ব'লে অনুমান করে; তফাৎ শুধু এই, সমুদ্রের ঢেউ অতি দীর্ঘ, কিন্তু আলোর ঢেউ অতি ক্ষুদ্র—তার হাজার হাজার ঢেউ মাত্র এক ইঞ্চি স্থানে সন্নিবিষ্ট হতে পারে। যে-ভাবে সমুদ্রের ঢেউ ছোটো পাহাড়কে ঘুরে যায়, আলোর ঢেউও বাধা-সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্র পদার্থকে ঠিক সে-ভাবেই ঘুরে যায়। বহু মাইল বিস্তৃত পাহাড় সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে, কিন্তু ছোটো পাহাড় সেরূপ আশ্রয় দিতে পারে না ; ঢেউগুলি তার উভয় দিক ঘুরে গিয়ে পিছনে আবার সম্মিলিত হয়। আলোর ঢেউও ঠিক এ-ভাবেই সরু সুতো বা চুলের পিছনে গিয়ে জড়ো হয়। বন্দরের প্রবেশ-মুখে যে-সব ঢেউ এসে পৌঁছয় তারা সোজাসুজি বন্দরে না ঢুকে বাধাদানকারী কঠিন পদার্থের (Break water) ধার ঘেঁষে বেঁকে গিয়ে বন্দরের সমস্ত জলকে

তোলপাড় করে তোলে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আলোর ঢেউও অতিক্ষুদ্র ফুটোর ধার স্পর্শ করে বেঁকে গিয়ে যে-বিক্ষোভের সৃষ্টি করে তা ২নং প্লেটের প্রথম ছবি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আলোকে মনে করা হতো বস্তুকণার বর্ষণ ব'লে; এই মতবাদের সাহায্যে ক্ষুদ্র পরিমাপের ঘটনাবলীর সম্যক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, এ-তথ্য জানা যাবার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তরঙ্গের দল এসে বস্তুকণা বর্ষণের স্থান অধিকার করল।

কিন্তু এই স্থানবিনিময়ে আনুষঙ্গিক বাধাবিঘ্ন এসে হাজির হল। তিন-পিঠওয়ালা কাঁচের (Prism) ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো পার করলে তা রামধনুর মতো সাতরঙা বর্ণালিতে বিভক্ত হয়, পর পর রঙ বিছানো হয়—লাল, নারাঙি (Orange), হল্‌দে, সবুজ, নীল, অতিনীল (Indigo) ও বেগনি (Violet)। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, আলো যদি কেবলমাত্র ঢেউয়ের সমষ্টি হতো, তাহলে এ-তথ্য প্রমাণ করা যায় যে বিশ্লিষ্ট সূর্যালোকের সমস্ত আলোই গিয়ে জড়ো হবে বর্ণালির বেগনি রঙের প্রান্তসীমায়। শুধু তাই নয়, বেগনি আলোর ঢেউয়ের তেজ শোষণের ক্ষমতা তাহলে হতো অপরিসীম; আর যেহেতু তাদের প্রবেশমুখ চিরদিন মুক্ত, বিশ্বের সমস্ত তেজসম্বল অতি দ্রুত রূপান্তরিত হতো বেগনি বা বেগনি পারের (Ultra-Violet) বিকিরণে। মহাশূন্য প্লাবিত হতো এই বিকিরণের ছটায়।

তরঙ্গবাদের এই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস থেকেই কণিকাবাদের উৎপত্তি। এই নূতন মতবাদ পূর্ণ সফলতা লাভ করেছে; আলো কণাধর্মী, নিউটনের এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়, একথা সে প্রমাণ করেছে। কারণ, বৃষ্টির ধারাকে যেমন জলের কণায় বিভক্ত করা যায়, গুলিবর্ষণকে বিচ্ছিন্ন সীসের টুকরোতে বা বায়বকে মুক্ত অণুতে বিভক্ত করা যায়, ঠিক

তেমনি এ-তথ্য প্রমাণ হয়েছে যে আলোর রশ্মিও বিচ্ছিন্ন আলো-কণায় বিভক্ত, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'আলো-কণিকা' বা 'ফোটোন' (Light-quanta or Photons)। এতে আলোর তরঙ্গধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র আলো-কণার দৈর্ঘ্যের প্রকৃতি সম্পন্ন একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে; একে বলা হয় আলোকণার 'তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য' (Wave-length), কারণ এই আলো তিনপিঠওয়ালা কাঁচের ভিতর দিয়ে পার হয়ে এলে তার আচরণ হয় অবিকল এই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যমাত্রার ঢেউয়ের মতো। বৃহৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে তেজের পরিমাণ কম, আবার যে-আলোর তেজমাত্রা কম তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃহৎ। প্রত্যেকটি আলো-কণাতে, তেজের পরিমাণ ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিপরীত অনুপাতে (Inversely Proportional) যুক্ত; কাজেই ফোটোনের তেজমাত্রা তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে হিসেব করা যায়, আবার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও তার তেজমাত্রা থেকে নির্ণয় করা যায়।

যে-বহুসংখ্যক তথ্যকে আশ্রয় করে এই মতবাদ গড়ে উঠেছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও অসম্ভব। প্রত্যেকটি তথ্যই একথা প্রমাণ করেছে যে অবিভক্ত 'ফোটোন' রূপেই আলো পরীক্ষাগারের যন্ত্রের ভিতর দিয়ে চলাচল করে। আজ পর্যন্তও এমন পরীক্ষার কথা শোনা যায়নি যাতে ফোটোনের ভগ্নাংশের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে বা তার অস্তিত্ব সন্দেহ করার কোনোরূপ অবকাশ ঘটেছে। দুটি উদাহরণ দিলে হয়তো সবই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

অনুকূল অবস্থায়, বিকিরণের আঘাতে পরমাণু ভেঙে পড়তে পারে। বিখণ্ডিত পরমাণুর দলকে পরীক্ষা করলে জানা যায় প্রত্যেকটি পরমাণু ভাঙতে কি পরিমাণ তেজের প্রয়োজন হয়েছে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে এই তেজ হিসেব করে দেখা গেছে যে তার মাত্রা একটি অখণ্ড ফোটোনের

তেজমাত্রার একেবারে সমান। এ-যেন আলো-বাহিনীর (army of light) সঙ্গে পদার্থ বাহিনীর (army of matter) সংঘাত। অনেক দিন আগেই জানা গেছে এই পদার্থ-বাহিনী, পরমাণু নামধারী সৈন্য দিয়ে গঠিত; এখন দেখা গেল আলো-বাহিনীও ফোটোন নামধারী সৈন্যের সমষ্টি। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সম্যক বিচার করলে জানা যায়, এ-যেন হাতাহাতি লড়াই চলছে।

ইলেকট্রনের উপর র‍্যণ্টগেন-রশ্মির আঘাতের ফলাফল সম্প্রতি পরীক্ষা করছেন শিকাগো শহরের অধ্যাপক কম্‌টন (Compton); এই হল দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। তিনি দেখলেন যে এই সংঘাতে র‍্যণ্টগেন-রশ্মি এমন-ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়, যাতে মনে হয় এ-যেন আলোর বস্তুকণা (material particles of light) বা ফোটোন; যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ষিত গুলির মতোই এরা ছুটে চলে পৃথক সত্তা (Separate detached units) নিয়ে, যে-ইলেকট্রনের দল পথ জুড়ে দাঁড়ায় তাদের করে আঘাত। এই সংঘাতে ফোটোন তার নির্ধারিত গতিপথ থেকে যতটা বিচ্যুত হয়ে পড়ে তার থেকেই ফোটোনের তেজমাত্রা হিসেব করা সম্ভব হয়েছে; এই তেজমাত্রা ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে নির্ণীত তেজমাত্রায় এতটুকু ভেদ নেই।

ফোটোন অবিভাজ্য, এই মতবাদ আবার আমাদের অনির্দেশ্যতার দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এমন কতগুলি পদ্ধতি আছে যাদের সাহায্যে একটি আলোর রশ্মিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক পথে, চালিত করা যায়। এই রশ্মি যখন একটি মাত্র ফোটোনে এসে ঠেকে তখন তাকে, এই পথ দুটির যে-কোনো একটি পথ ধরে, চলতেই হবে; উভয় পথে একই সময়ে সে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে পারে না, কারণ ফোটোন অবিভাজ্য, তার এই পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা 'সম্ভাবনার' সীমায় আবদ্ধ, নির্দেশ্যতার গণ্ডীতে নয়।

সপ্তদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আলোকে যথাক্রমে বস্তুকণা ও তরঙ্গ ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছিল; এখন দেখা যাচ্ছে উভয় মতবাদই ভুল কিংবা একথাও বলা যায় উভয়ই নির্ভুল। আলো, বস্তুতঃ সর্বপ্রকার বিকিরণই, একসঙ্গে বস্তু ও তরঙ্গধর্মী। অধ্যাপক কম্‌টনের পরীক্ষায় র‍্যাণ্টগেন-রশ্মি পৃথক পৃথক ইলেকট্রনের উপর পতিত হয়ে বিচ্ছিন্ন বস্তুকণা বর্ষণের মতো আচরণ করে। আবার লাওয়ে (Laue) ব্র্যাগ (Bragg) ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় ঠিক এই রশ্মিই কঠিন দানাদার পদার্থের উপর পড়ে সর্বতোভাবে তরঙ্গধর্মের পরিচয় দেয়। প্রকৃতির সর্বত্রই এই ব্যবস্থা—একই বিকিরণ একই সময়ে বস্তু ও তরঙ্গের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কখনো তার আচরণ বস্তুকণার মতো, কখনো বা তরঙ্গের মতো; আজও এমন কোনো সাধারণ সূত্রের সন্ধান মেলেনি যার সাহায্যে পূর্বাহ্লেই বলা চলে কোন ক্ষেত্রে সে কোন ভূমিকা গ্রহণ করবে।

বস্তুকণা ও তরঙ্গ মূলত একই পদার্থ, শুধু এরূপ অনুমান করেই প্রকৃতির সমতার উপর আমাদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি। এর থেকেই, আমাদের আলোচনার অধিকতর বিস্ময়কর দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করছি। প্রথম পর্ব হল, বিকিরণ কখনও তরঙ্গ কখনও বা বস্তুকণা রূপে প্রকাশ পায়; দ্বিতীয় পর্ব হল—সমস্ত পদার্থের মূল উপাদান, ইলেকট্রন ও প্রোটোন এরাও কখনো বস্তুধর্মী কখনো বা তরঙ্গধর্মী। বিকিরণের মূল প্রকৃতির মতো, ইলেকট্রন ও প্রোটোনের প্রকৃতিতেও সম্প্রতি এই দ্বৈতধর্মের সন্ধান মিলেছে; একই সময়ে এরাও বস্তুকণা ও তরঙ্গরূপে প্রকাশ পায়।

তরঙ্গবাদ নিউটনের কণাবাদকে আসনচ্যুত করার পর, তরঙ্গ কেমন করে বস্তুকণা বর্ষণের ভূমিকা গ্রহণ করতে আর প্রতিফলন বা প্রতিসরণের

প্রভাবে গতিপথ থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হওয়া ছাড়া সরল রেখা ধরে চলতে পারে, তার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কারণ ছোটো একটি ফুটো দিয়ে ঘরের মধ্যে যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে তা যদি তরঙ্গ সমষ্টি হয়, তাহলে এরূপ আশা করা স্বাভাবিক যে এই তরঙ্গদল সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়বে; যেমন করে একটি মাত্র ঢেউ সারা পুকুরের জলে ছড়িয়ে পড়ে বা সংকীর্ণ আলোকরশ্মি ক্ষুদ্র একটি ফুটো পার হয়ে এসে বিস্তৃত হয় (২নং প্লেটের ১ম চিত্র)। কিন্তু ইয়ং (Young) ও ফ্রেনেল (Fresnel) প্রমাণ করলেন যে বিস্তৃত ও অক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত না হয়ে, মুক্ত বস্তুকণা বর্ষণের মতোই এগিয়ে চলে; আর, গতিশীল বস্তুকণা যে-ভাবে কঠিন ক্ষেত্রতলে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে এই তরঙ্গদলও ঠিক সে-ভাবেই প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়। আবার এও তাঁরা প্রমাণ করলেন যে আলোকের প্রতিসরণের পরিচিত নিয়মাবলী মেনে তরঙ্গের প্রতিসরণ ঘটে। প্রতিসরণ-শক্তি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে এমন কোনো মাধ্যমের ভিতর দিয়ে এই তরঙ্গ চলতে থাকলে, নিরন্তর ক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাবে সরল পথ থেকে বিচ্যুত বস্তুকণার মতোই, তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বস্তুতঃ এই দুটি গতিপথকে অভেদ প্রতিপন্ন করা যায়, যদি প্রতিবিন্দুতে ক্রিয়াশীল শক্তিকে প্রতিসরাঙ্কের বর্গের ভেদমাত্রার সমানুপাতিক ব'লে (Proportional to the change in the square of the refractive-index) ধরে নেওয়া হয়। নিউটনের ৯৪ ও ৯৬ সম্পাদ্যের (৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা) সাফল্য এর থেকেই ব্যাখ্যা করা হল।

নিউটনের কণাবাদে প্রবর্তিত বস্তুকণার কার্যধারা ও তরঙ্গের কার্যধারায় কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু অধিকতর জটিল ব'লে তরঙ্গের কার্যব্যাপকতা বেশি; যে-ক্ষেত্রে বস্তুকণা আলোর আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারে না,

তরঙ্গ সে-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সে-অভাব পূর্ণ করেছে। নিউটন প্রবর্তিত বস্তুকণা এ-ভাবেই তরঙ্গে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

গত কয়েক বছরের মধ্যে, সাধারণ পদার্থের উপাদান বস্তু প্রোটোন ও ইলেকট্রন, অনেকটা এ ভাবেই তরঙ্গে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বহুক্ষেত্রেই প্রোটন-ইলেকট্রনের আচরণ এত বেশি জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে, যে শুধু বস্তুকণার গতির সাহায্যে এই আচরণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। লুই ডি ব্রাগলী (Louis de Broglie), শ্রয়ডিংগের (Schrodinger) ও আরো অনেকে ইলেকট্রন-প্রোটোনের এই আচরণকে একদল তরঙ্গের আচরণ ব'লে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন; তাতেই গড়ে উঠেছে গাণিতিক বিজ্ঞানের এক নূতন শাখা, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'তরঙ্গ-বলবিদ্যা' (Wave-Mechanics)।

কঠিন টেনিস-মাঠ থেকে প্রতিহত একটি টেনিস-বলকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তার গতি ও প্রতিফলিত আলোকরশ্মির গতি অনুরূপ; কাজেই একথা বলা যায় যে বলটি মাঠের উপরিতল থেকে 'প্রতিফলিত' হয়েছে। কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে খুব বেশি লাভ হয়নি। ইচ্ছে করলে, এর থেকে টেনিস-বলকে নিঃসন্দেহে একদল তরঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তা আমরা করি না; কারণ একটা জিনিস দেখতে পাই, বা দেখতে পাই ব'লে মনে হয় যে টেনিস-বল আর যাই হোক তরঙ্গসমষ্টি নয়।

গতিশীল পদার্থ, টেনিস-বল না হয়ে, ইলেকট্রন হলে সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কোনো ক্ষেত্রতল থেকে প্রতিহত ইলেকট্রনের গতি যদি তরঙ্গের গতির অনুরূপ ব'লে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে ইলেকট্রন যে তরঙ্গ বিশেষ এই সম্ভাবনাকে কোনো যুক্তিই উড়িয়ে দিতে পারে না। একথা এখন কেউ বলতে পারে না—'এতে আমার কোনো কৌতূহল নেই—

ইলেকট্রনকে আমি দেখতে পাচ্ছি, সে তরঙ্গধর্মী নয়' ; কারণ আজ পর্যন্তও ইলেকট্রনকে কেউ দেখতে পায়নি, বা তার আকৃতি সম্বন্ধে কারও কোনো সুদূর ধারণাও নেই। নিউটনের আলোক-কণাকে যেমন তরঙ্গ ব'লে মনে করা যায়, ঠিক তেমনি ইলেকট্রনকেও তরঙ্গ ব'লে ভাবতে পারি। ইলেকট্রন প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গধর্মী কিনা এ-তথ্য যাচাই করতে হলে এমন ঘটনার আশ্রয় নিতে হবে যাতে কঠিন বস্তুকণা ও তরঙ্গের আচরণে ভেদ দেখা যায়।

ইলেকট্রনকে বস্তুকণা ব'লে মেনে নিয়ে, যে-সব ঘটনাতে তার আশানুরূপ আচরণ দেখতে পাওয়া যায় না, ঠিক তেমন ঘটনাই আমাদের আবশ্যক। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ইলেকট্রনের ব্যবহার একেবারে তরঙ্গের মতো। ধাতুফলক থেকে এক ঝাঁক ইলেকট্রনের বিক্ষেপ হল এই ধরনের একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ; বরফের টুকরো বা টেনিস-বলের মতো ইলেকট্রনের দল প্রতিফলিত না হয়ে ঠিক তরঙ্গের মতোই বিক্ষিপ্ত হয় (২নং প্লেট, ৩য় ছবি) ও 'অপবর্তন বৃত্তের' (৬৬ পৃষ্ঠা) সৃষ্টি করে। খুব ছোটো ফুটোর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের ঝাঁক বর্ষিত হলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায় ; আলোক-তরঙ্গ যেমন অপবর্তন বৃত্তের সৃষ্টি করে (২নং প্লেট, ১ম ও ২য় ছবি), ইলেকট্রনের দলও পার্শ্বদিকে বিস্তৃত হতে হতে অনেকটা সেই রকমের বৃত্ত গঠন করে। এই তথ্য থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে ইলেকট্রন প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গসমষ্টি ; কিন্তু একটা প্রশ্নের উদয় হয়, কঠিন বস্তুকণার চেয়ে তরঙ্গ ইলেকট্রনের রূপ অধিকতর সুন্দরভাবে প্রকাশ করে কিনা। বস্তুতঃ ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ তার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্দেশ করতে আজ পর্যন্তও কোনো ক্ষেত্রেই বিফল হয়নি, কিন্তু তার বস্তুকণারূপ বহুক্ষেত্রে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

আধুনিক তরঙ্গ-বলবিদ্যা এ-তথ্য প্রমাণ করেছে যে গতিশীল ইলেকট্রন-

প্রোটোনের আচরণ হবে নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একদল তরঙ্গের মতো। গতিশীল কণার গতি ও বস্তুমাত্রা ছাড়া এই আচরণ আর কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না। পরীক্ষাগারের সাধারণ অবস্থায় গতিশীল ইলেকট্রন-প্রোটোনের উপর যে-সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরোপিত হয়, সাধারণ যন্ত্রাবলীর সাহায্যে সহজেই তাদের পরিমাপ করা সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে যাদের ইলেকট্রনের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ পরীক্ষা বলা যায়, সেরূপ পরীক্ষা করেছেন আমেরিকাতে ডেভিসন ও জারমার (Davisson and Germer), এ্যাবারডিনে অধ্যাপক জি. পি. টমসন (G. P. Thomson), জার্মানীতে রুপ (Rupp), জাপানে কিকুচি (Kikuchi) ও আরো অনেকে। সমান্তরাল রশ্মির মতো ইলেকট্রনের দল বর্ষিত হয় ধাতুফলকের উপর; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যথাস্থানে রক্ষিত ফটোগ্রাফের প্লেটে যে-চিহ্ন ধরা পড়ে তা, ইলেকট্রন কঠিন বস্তুকণা বা ক্ষুদ্র গোলকের বর্ষণ হলে যা হতো, মোটেই সেরূপ নয়। পর পর সজ্জিত কতকগুলি উজ্জ্বল ও কালো এককেন্দ্রিক অপবর্তন বৃত্তের সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কতকগুলি তরঙ্গ ধাতুফলকের উপর পড়লে যে ধরনের বৃত্ত সৃষ্টি হওয়ার কথা, এই বৃত্তগুলিও ঠিক সেই ধরনের। তরঙ্গ-বলবিদ্যার সূত্র থেকে যে-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পূর্বাহ্নেই হিসেব করে বার করা যায়, পরিমাপ করলে দেখা যায় এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (বৃত্তসৃষ্টিকারী তরঙ্গের) সঙ্গে তার এতটুকু ভেদ নেই। অল্প কিছুদিন হল শিকাগো শহরের অধ্যাপক এ. জে. ডেম্পষ্টার (A. J. Dempster) গতিশীল প্রোটোনের পরীক্ষা থেকে অনুরূপ ফল লাভ করেছেন।

এ-সব ও অন্যান্য পরীক্ষা থেকে এখন পরিষ্কার জানা গেছে যে গতিশীল ইলেকট্রন-প্রোটোন আশ্রিত তরঙ্গ ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিছক কল্পনা নয়, খানিকটা বাস্তবতার দাবীও তারা করতে পারে। আন্দোলনের মতো

একটা কিছু নিঃসন্দেহে এদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ; পুরানো যে ছবিতে গতিশীল ইলেকট্রন-প্রোটোনকে শুধু বৈদ্যুতাশ্রিত বস্তুকণা ব'লে মনে করা হতো, তার চেয়ে যে ছবিতে তাদের তরঙ্গসমষ্টি ব'লে বর্তমানে মনে করা হয় তা, পরমাণুর অভ্যন্তরে ও বহিঃসীমায়, অধিকতর সফলতার সঙ্গে তাদের আচরণ ব্যাখ্যা করে।

এই তরঙ্গের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব। পদার্থের মূল উপাদান (ইলেকট্রন ও প্রোটোন) ও বিকিরণ যে দ্বৈতধর্মী এটুকুই বর্তমান আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট। বৃহৎ পরিমাপের ঘটনাবলীতে বিজ্ঞানের আলোচনা যতক্ষণ সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ উভয়কে বস্তুধর্মী ব'লে কল্পনা করলে সাধারণত একটা গ্রহণযোগ্য ছবি পাওয়া যায় ; কিন্তু বিজ্ঞান যখন প্রকৃতির অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে ক্ষুদ্র পরিমাপের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, তখন বস্তু ও বিকিরণ সমভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে তরঙ্গে।

প্রাকৃতবিশ্বের মূল প্রকৃতি বুঝতে হলে ক্ষুদ্র পরিমাপের ঘটনাবলীর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে ; এই অপ্রকাশলোকের অন্তরেই অলক্ষ্যে নিহিত রয়েছে বস্তুজগতের মূল রহস্য, কিন্তু প্রকাশলোকের সীমানায় যা পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তা হল তরঙ্গ।

এ-ভাবেই মনে সংশয়ের সঞ্চার হচ্ছে যে এক তরঙ্গবিশ্বেই আমাদের বাস ; এই তরঙ্গের মূল প্রকৃতির আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করব। বিশ্বজগৎ শুধু কঠিন বস্তুর সমষ্টি, আর তাতে বিকিরণ-তরঙ্গের মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটে, পূর্ববর্তী এই চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে নববিজ্ঞান বহুদূর অগ্রসর হয়েছে ; বর্তমানে এটুকু জানাই যথেষ্ট। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাবে এই পথ ধরেই আমরা আরো এগিয়ে গিয়েছি।

****

তৃতীয় অধ্যায়

বস্তু ও বিকিরণ

(MATTER AND RADIATION)

বিজ্ঞানযুগের প্রারম্ভে, প্রাকৃত জগতের পথনির্দেশক সূত্র হিসেবে কার্যকারণবাদ অবিসংবাদী সত্য ব'লে স্বীকৃত হওয়ায়, এই ধরনের সাধারণ নিয়মাবলীর আবিষ্কার হল—"আরোপিত 'ক' কারণ নির্দিষ্ট 'খ' ফল প্রদর্শন করে।" যেমন, উত্তাপে বরফ গলে যায় ; আরও বিশদভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, তাপের প্রভাবে বিশ্বে-বরফের পরিমাণ কমতে থাকে, জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

আদিম যুগের মানুষ অতি সহজেই এই নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হতো—বরফের উপর সূর্যের আলোর প্রভাব বা পার্বত্য তুষারনদীর উপর দীর্ঘ গ্রীষ্মকালের প্রভাব দেখলেই তার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে উঠত। শীতকালে সে দেখত ঠাণ্ডায় জল জমে গিয়ে আবার বরফে রূপান্তরিত হয়েছে। পরে হয়তো এই তথ্য সে আবিষ্কার করেছিল যে গলে যাবার পূর্বে বরফের পরিমাণ ও ঠাণ্ডায় পুনর্বার জমাট-বাঁধা এই বরফের পরিমাণে কোনো ভেদ নেই। তাই এরূপ অনুমান করা স্বভাবিক যে, 'বরফ ⟶ জল ⟶ বরফ' এই রূপান্তর প্রতিক্রিয়াতে জল বা বরফের চেয়ে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত 'একটা কিছুর' পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

এই ধরনের নিয়মাবলীর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, এদের বলা হয় 'অবিনাশিতা বা শাশ্বত নিয়ম' (Conservation laws)। যাকে এইমাত্র আদিম মানুষের আবিষ্কার ব'লে বলা হল তা জড়ের

অবিনাশিতা নিয়মেরই একটি বিশেষ ঘটনা। 'x' যা-কিছুই হোক না, তার অবিনাশিতা বলতে এই বোঝায় যে বিশ্বে তার সমগ্র পরিমাণ চিরদিনই অক্ষুণ্ন থাকবে; কোনো কিছুই 'x'কে 'x' থেকে পৃথক, অন্য আর কিছুতে পরিবর্তিত করতে পারে না। এ-সব নিয়মের প্রত্যেকটি কল্পনাপ্রসূত; এদের মূল অর্থ হল এই যে, আজ পর্যন্তও এমন কোনো প্রক্রিয়ার সন্ধান মেলেনি যার সাহায্যে 'x'এর পূর্ণমাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। নানারকমে পরীক্ষা করেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যদি অকৃতকার্য হই, তাহলে অন্তত কার্যকরী সংকল্প হিসেবে 'x'এর অবিনাশিতাকে মেনে নেওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাকৃত বিজ্ঞান তিনটি প্রধান অবিনাশিতা নিয়ম স্বীকার করেছে—

ক—জড়ের অবিনাশিতা (Conservation of Matter)

খ—জড়মাত্রার (জড়মানের) (Conservation of Mass)

গ—তেজ বা শক্তির অবিনাশিতা (Conservation of Energy)

সরল ও কৌণিক বেগভারের অবিনাশিতা (Conservation af linear and angular momenta), এ-সব ছোটোখাটো নিয়মের আলোচনা না করাই ভালো, কারণ পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান নিয়মেরই এরা অঙ্গীভূত।

এই তিনটি নিয়মের মধ্যে 'জড়ের অবিনাশিতা'র আসন ছিল সকলের উর্ধ্বে। ডেমোক্রেটস্ ও লুক্রেটিয়স-এর (Democritus and Lucretius) পরমাণু-দর্শনে এর কথা উল্লেখ আছে। এই দর্শনের মতে—পদার্থমাত্রই কতকগুলি অসৃজনীয় (uncreatable), অপরিবর্তনীয় (unalterable) ও অবিনশ্বর (indestructible) পরমাণুর সংযোগে গঠিত; বিশ্বের বস্তুভাণ্ডার অক্ষয়, আর বিশ্বের বা মহাশূন্যের যে-কোনো অংশে অবস্থিত বস্তুপদার্থের সমষ্টিগত পরিমাণে কোনো ভেদ

ঘটে না, যদি ভিতর বা বাইরে থেকে পরমাণুর নির্গমনে বা আগমনে কোনো পরিবর্তন না ঘটায়। বিশ্ব যেন একটা বিরাট রঙ্গমঞ্চ, এখানে পরমাণু নামধারী একই অভিনেতার দল তাদের যথার্থ পরিচয় গোপন না করে, বিভিন্ন সাজে, বিভিন্ন দলে, আপন আপন ভূমিকা অভিনয় করে যাচ্ছে। মৃত্যু তাদের স্পর্শ করতে পারে না, তারা মৃত্যুঞ্জয়।

দ্বিতীয় নিয়ম—জড়মাত্রার অবিনাশিতা হল আধুনিক যুগের দান। নিউটনের মতে প্রত্যেক বস্তুরই একটা অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্ট বস্তুমাত্রা আছে, এই বস্তুমাত্রাই তার 'জড়তার' (inertia) বা গতিপরিবর্তনে অনাশক্তির পরিমাপক। দুটি মোটর গাড়ির মধ্যে গতিসমতা রক্ষা করতে হলে যদি একটির ইঞ্জিনশক্তি অপরটির দ্বিগুণ বাড়াতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে প্রথম গাড়ির বস্তুমাত্রা দ্বিতীয় গাড়ীর দ্বিগুণ। মহাকর্ষের নিয়ম একথাই বলে যে দুটি পদার্থের জড়মান ও তাদের উপর মহাকর্ষের টান ঠিক একই অনুপাতে জড়িত, তাই তাদের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি সমান হলে তাদের জড়মানও নিশ্চিত সমান হবে। দেখা যাচ্ছে, পদার্থের জড়মান হিসেব করার সব চেয়ে সহজ উপায় হল তার ওজন নির্ণয় করা।

কালক্রমে রসায়ন প্রমাণ করল যে লুক্রেটিয়স-এর 'পরমাণু' (Atoms) তাদের নামের মর্যাদা (অবিভাজ্যতা) রক্ষা করার অনুপযুক্ত। এরা মোটেই অবিভাজ্য নয়, তাই তখন থেকে এদের নাম দেওয়া হল 'অণু'; এদের সূক্ষ্মতর অংশের জন্য পরমাণু নামটা তোলা রইল। অণুর বিশ্লেষণ ও তার পরমাণু দলের পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করার অনেক উপায় আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অপর অণুর সংস্পর্শই যথেষ্ট, যেমন লোহার মরচে ধরা বা ধাতুর উপর এ্যাসিড ঢালা। দহন, বিস্ফোরণ, উত্তাপ বা আলোক সম্পাতেও অণুর বিশ্লেষণ ঘটতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এক বোতল হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (Hydrogen

Peroxide) কোনো আলোকিত স্থানে রাখলে, এই তরলপদার্থের প্রত্যেকটি অণু (H_2O) আলোর প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হয় একটি জলের অণুতে (H_2O_2) ও একটি অক্সিজেন পরমাণুতে (O) । বোতলের মুখ থেকে ছিপিটা খুলে নিলে অক্সিজেন গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসার দরুন একটা 'ফস্‌ফস্‌' (Pop) শব্দ শোনা যাবে, আর দেখা যাবে খানিকটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড জলে রূপান্তরিত হয়েছে। আলোক সম্পাতে সিলভার ব্রোমাইডের (Silver Bromide) অণু পুনর্বিন্যস্ত হয় ; এই পরিবর্তন আলোকচিত্র গ্রহণের মূল ভূমিকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লেভোসার-এর (Lavoisier) দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, যে-কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণকারী বস্তুপদার্থের মোট ওজনে কোনো ভেদ ঘটে না। যথাসময়ে 'জড়-মাত্রার অবিনাশিতা' নিয়ম বিজ্ঞানের অপরিহার্য তথ্য ব'লে স্বীকৃত হল। এখন জানা গেছে এই নিয়ম একেবারে নিখুঁত নয় ; পারঅক্সাইডের বোতল থেকে যে-অক্সিজেন ছাড়া পায় ও যে-তরলপদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাদের সম্মিলিত ওজন পূর্ববর্তী পারঅক্সাইডের ওজনের চেয়ে সামান্য বেশি। আবার ফোটোগ্রাফের প্লেটে আলো পড়লে তার ওজন বেড়ে যায়। শীঘ্রই দেখা যাবে এই নিয়ম নিখুঁত ব'লে পরিগণিত না হবার কারণ এই যে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বা সিলভার ব্রোমাইডের অণু দ্বারা শোষিত আলোর ওজন তার হিসেব থেকে বাদ পড়ে গেছে।

অতি আধুনিক হল তৃতীয় নিয়ম, 'তেজের অবিনাশিতা'। তেজ বা শক্তির প্রকাশ ঘটে বিচিত্ররূপে, তাদের মধ্যে সব চেয়ে সাধারণ রূপ হল গতিশক্তি —যেমন সমতল লাইনের উপর দিয়ে ট্রেনের গতি বা টেবিলের উপর বিলিয়র্ড বলের গতি। নিউটন প্রমাণ করেছেন যে এই যান্ত্রিক শক্তির বিনাশ নেই। যেমন দুটি বলের পরস্পর সংঘাতে উভয়েরই গতিশক্তির

পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তাদের সম্মিলিত শক্তির মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে ; উভয়ের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান চলতে থাকে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় শক্তির কোনো ক্ষয় বা বৃদ্ধি ঘটে না। বল দুটি 'সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক' (perfectly elastic) হলেই শুধু এরূপ ব্যাপার ঘটে ; এ হল একটা 'আদর্শ অবস্থা' (ideal condition) যাতে সংঘাতের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে বল দুটির গতি অক্ষুন্ন থাকে। প্রকৃতির বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এই যান্ত্রিক শক্তির অবধারিত ক্ষয়ই আপাত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ; হাওয়ার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বন্দুকের গুলির গতি হ্রাস হতে থাকে, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে গতি মন্দীভূত হয়ে যথাসময়ে গাড়ি থেমে যায়। এ-সব ব্যাপারে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, তাপ ও শব্দের সৃষ্টি হয়। নানা রকমের পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হয়েছে, তাপ ও শব্দ, শক্তিরই দুটি বিভিন্ন রূপ মাত্র। ১৮৪০-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জুল (Joule) বহু পরীক্ষার সাহায্যে তাপশক্তির পরিমাপ করেন ও বেহালার (Violoncello) একটি তার দিয়ে শব্দশক্তির মাত্রা নির্ধারণের চেষ্টা করেন। পরীক্ষাগুলি একেবারে নিখুঁত না হলেও, তাদের নির্ধারিত ফল থেকে 'শক্তির অবিনাশিতা' এমন একটি বিশেষ সূত্র হিসেবে স্বীকৃত হল, যার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তি, তাপ, শব্দ ও বিদ্যুৎশক্তি এই জাতীয় নানাবিধ শক্তিকে আশ্রয় করে যে-সব 'শক্তি-রূপান্তর' (transformation of energy) ঘটে, তাদের বিশদ ব্যাখা করা যায়। সংক্ষেপে এ-তথ্যই প্রমাণ হল যে শক্তির বিনাশ নেই, তার রূপান্তর ঘটে মাত্র। আপাত দৃষ্টিতে যে-গতিশক্তির বিনাশ দেখতে পাই, ঠিক সেই পরিমাণ শক্তিই পুনঃ প্রকাশিত হয় তাপ ও শব্দ রূপে। চলন্ত গাড়ির গতি-শক্তির পরিবর্তে সমমাত্রায় প্রকাশ পায়, ব্রেকের কর্কশ শব্দ ও রেল-ব্রেক-চাকার ঘর্ষণজনিত তাপশক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এই তিনটি অবিনাশিতা নিয়মের কোনো

ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়নি। জড় ও জড়মাত্রার অবিনাশিতার মধ্যে কোনো ভেদ আছে ব'লে মনে করা হতো না, কারণ পদার্থের জড়মাত্রাকে তার উপাদান বস্তুর (পরমাণুদলের) জড়মাত্রার সমষ্টি ব'লে ধরা হতো। এর থেকে অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা হল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মোট জড়মাত্রা কেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু নব আবিষ্কৃত 'শক্তির অবিনাশিতা নিয়ম', পুরানো আর দুটি নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েই রইল। বিশ্বকে তখনও মনে করা হতো একটি রঙ্গমঞ্চ ব'লে যেখানে অভিনেতা হল পরমাণুর দল, যারা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও জড়মান চিরকাল অক্ষুণ্ণ রেখেই চলবে। তার মধ্যেই সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা নিয়ে এল 'শক্তি', অভিনেতাদের মধ্যে চলল তার আদান-প্রদান; আর এই অভিনেতাদের মতোই তার সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই।

এই অবিনাশিতা নিয়ম তিনটিকে শুধু কার্যকরী সূত্র হিসেবে প্রয়োগ করাই ভালো; নানাবিধ উপায়ে এদের পরীক্ষা করতে হবে, কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি ধরা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এমন সুদৃঢ় ব'লে মনে হতো যে অবিরোধী সর্বগত নিয়ম ব'লেই এদের মেনে নেওয়া হয়েছিল। এ-সব নিয়মাবলী সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা এমন ভাষা প্রয়োগ করতেন যাতে মনে হতো যে এরাই যেন সমগ্র সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করছে, আর এরই উপর ভিত্তি করে তৎকালীন দার্শনিকেরা বিশ্বের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করতেন।

এ-যেন ঝড়ের পূর্বে একটা প্রশান্ত ভাব। আসন্ন ঝড়ের দূরাগত কোলাহল প্রথম এসে পৌছল স্যর জে. জে. টমসনের পরীক্ষা থেকে; তিনি হিসেব কষে প্রমাণ করলেন যে বৈদ্যুত আশ্রিত বস্তুর মধ্যে গতির সঞ্চার করলে তার জড়মাত্রার পরিবর্তন ঘটানো যায়। গতির মাত্রা যত বাড়তে থাকবে

বস্তুর জড়মাত্রার পরিমাণও তত বেড়ে চলবে। জড়মাত্রা অপরিবর্তনীয় রাশি, নিউটন এই মতবাদের প্রবর্তন করেছিলেন; কিন্তু দেখা গেল, বর্তমান তথ্য তার সম্পূর্ণ বিরোধী। মনে হচ্ছে জড়মানের অবিনাশিতাসূত্র বিজ্ঞানের প্রত্যন্ত দেশে একঘরে হয়ে রইল।

কিছুকালের জন্য এই সিদ্ধান্ত শুধু আলোচনার বিষয় হয়েই দাঁড়াল। পরীক্ষার সাহায্যে এর মীমাংসা তখনও সম্ভব হয়নি; কারণ যে-পরিমাণ বৈদ্যুত আশ্রিত হলে ও গতি বৃদ্ধি হলে কোনো বস্তু এই মতবাদ নির্ধারিত জড়মাত্রার ভেদকে পরিমাপের আয়ত্তগম্য সীমায় এনে দিতে পারে, সাধারণ বস্তুতে সেই পরিমাণ বৈদ্যুত ও গতি সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। তারপর, উনবিংশ শতাব্দী যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, স্যর জে. জে. টমসন ও তাঁর অনুসরণকারী বিজ্ঞানীরা পরমাণুর বিশ্লেষণ ঘটাতে শুরু করলেন; 'পরমাণু'কে তখন আর অবিভাজ্য বলা গেল না, নামটাই তার মিথ্যে হয়ে দাঁড়াল। পরমাণু থেকে তাঁরা শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাই বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে তার চরম উপাদান পদার্থে (ultimate constituents) বিশ্লিষ্ট করতে আজ পর্যন্ত কেউ পূর্ণ-সফলতা লাভ করতে পারেনি। পরমাণু-ভাঙা এই কণিকাগুলি সবই ঠিক এক জাতের, আর এদের প্রত্যেকটিকে আশ্রয় করে আছে নিগেটিভ-বৈদ্যুত; তাই এদের নাম দেওয়া হল 'ইলেকট্রন'।

সাধারণ বস্তুতে যে-পরিমাণ বৈদ্যুতসঞ্চার করা যায়, ইলেকট্রন আশ্রিত বৈদ্যুতমাত্রা তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। এক গ্রাম সোনাকে পিটে এক বর্গগজ একটি ফলকে পরিণত করলে, সৌভাগ্যক্রমে হয়তো তার মধ্যে ৬০,০০০ স্থির-বিদ্যুত-এককের (Electro-Static Units) বৈদ্যুতশক্তি সঞ্চিত হতে পারে; কিন্তু এক গ্র্যাম ওজনের ইলেকট্রন সংঘের সম্মিলিত বৈদ্যুতমাত্রা এর চেয়ে ন'লক্ষ কোটিগুণ বেশি। এই জন্যে ও বৈদ্যুতিক

প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনের গতিমাত্রা সেকেণ্ডে লক্ষ মাইলেরও বেশি বৃদ্ধি করা সম্ভব ব'লে, গতির সঙ্গে ইলেকট্রনের জড়মাত্রার পরিবর্তন প্রমাণ করা সহজ হল। নিখুঁত পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে এই পরীক্ষালব্ধ মতবাদ নির্ধারিত পরিবর্তনের মাত্রায় এতটুকু ভেদ নাই।

রাদারফোর্ডের গবেষণার কৃতিত্বে এ-তথ্য আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে পরমাণুমাত্রই নিগেটিভ-বৈদ্যুত আশ্রিত ইলেকট্রন ও পজিটিভ-বৈদ্যুত আশ্রিত প্রোটোন কণার সমষ্টি। ক্ষুদ্র বৈদ্যুতকণার সমষ্টি ছাড়া পদার্থ আর কিছুই নয়। বস্তুর ধর্ম ও গঠনরীতি যে-সব বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ছিল, এই আমূল পরিবর্তনের অভিঘাতে তারা একমাত্র বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভূত হল। এর আগে ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করেছিলেন যে সব বিকিরণই বৈদ্যুতধর্মী, কাজেই সমগ্র প্রাকৃত বিজ্ঞানকেই এখন বিদ্যুত-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত বলা যেতে পারে।

বস্তুমাত্রই বৈদ্যুতকণার সমষ্টি ব'লে পূর্বোক্ত মতবাদ অনুসারে একথাই প্রমাণ হয়, যে-কোনো গতিশীল বস্তুর জড়মাত্রা তার গতির সঙ্গে পরিবর্তিত হবে। এরূপ বস্তুর জড়মাত্রা দুই ভাগে বিভক্ত ব'লে মনে করা যেতে পারে—একটি হল অপরিবর্তনীয় অংশ, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্থির-জড়মাত্রা' (Rest-Mass), বস্তু গতিহীন হলেও তা বস্তুর সঙ্গে জড়িত থাকে ; অপরটি হল পরিবর্তনীয় (Variable) অংশ, যা নির্ভর করে বস্তুর গতিমাত্রার উপর। পরীক্ষা ও হিসেব থেকে প্রমাণ হয়েছে যে এই দ্বিতীয় অংশ বস্তুর গতি-শক্তির সঙ্গে একেবারে সমানুপাতিক (exactly proportional)। দুটি ইলেকট্রন বা যে-কোনো দুটি অনুরূপ বস্তুর যে পরিমাণ শক্তিভেদ বর্তমান তাদের জড়মানের ভেদমাত্রাও ঠিক তাই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন এই তথ্যকে এক বিরাট ব্যাপক সিদ্ধান্তে

টেনে নিয়ে গেলেন। তিনি প্রমাণ করলেন—শুধু গতিশক্তি নয় যে-কোনো জাতীয় শক্তিরই একটা জড়মান আছে; তা না হলে আপেক্ষিকবাদ কখনই সত্য হতে পারত না। এ-ভাবেই আপেক্ষিকবাদের প্রতিষ্ঠা কল্পে যে-কোনো পরীক্ষা করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি, তেজের জড়মাত্রার অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছে। আইনস্টাইনের আলোচনা থেকে জানা গেছে, যে-কোনো জাতীয় তেজের জড়মান নির্ভর করে শুধু তার তেজমাত্রার উপর, আর এই তেজমাত্রা ও জড়মান একেবারে সমানু-পাতিক। তেজের জড়মান পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র। সম্পূর্ণ বোঝাই করলে 'মরিটেনিয়া' জাহাজের ওজন হয় ৫০,০০০ টন; তার গতি যখন ঘণ্টায় প্রায় ২৯ মাইল হয়, তখন এই গতি বৃদ্ধির দরুন তার ওজন বাড়ে এক আউন্সেরও লক্ষভাগের একভাগ মাত্র। দীর্ঘজীবনব্যাপী কঠিন কায়িক শ্রমে একজন লোক যে-শক্তি প্রয়োগ করে তার ওজন হল এক আউন্সের ৬০,০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এই আবিষ্কারই জড়মাত্রার অবিনাশিতা নিয়মকে তার পূর্ব আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। কারণ জড়মান হল, 'স্থির-জড়মান' ও 'তেজ-জড়মানের' (Energy-mass) সমষ্টি; আর পৃথকভাবে উভয়েই যখন এরা অবিনশ্বর (স্থির-জড়মান অবিনশ্বর, কারণ পদার্থ অবিনশ্বর; আবার তেজ-জড়মান অবিনশ্বর, কারণ তেজ অবিনশ্বর) তখন মোট জড়মানও অবিনশ্বর হতে বাধ্য। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের মতে জড়মাত্রার অবিনাশিতা হল জড়ের অবিনাশিতার স্বাভাবিক পরিণতি। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দান হল তেজের অবিনাশিতা; তাই দেখা যাচ্ছে বস্তু ও তেজ পৃথকভাবে অবিনশ্বর ব'লেই জড়মাত্রাও অবিনশ্বর।

যতদিন পরমাণুকে মনে করা হতো 'নিত্য ও অবিনশ্বর' (permanent and indestructible) [ম্যাক্সওয়েলের ভাষায় যাদের 'বিশ্বরচনার

অক্ষয় ভিত্তি প্রস্তর' বলা হয়েছে (The imperishable foundation stones of the Universe)] ততদিন বিশ্বের মূল উপাদান ব'লে তাদের স্বীকার করা স্বাভাবিক ছিল। বিশ্বকে মনে করা হতো পরমাণু সংঘটিত বিশ্ব, তাতে বিকিরণ ছিল একেবারে গৌণপদার্থ। ঘণ্টাকে আঘাত করলে যেমন তা বেজে উঠে কিছুকাল পরে থেমে যায়, তেমনি পরমাণুর মধ্যেও আঘাতে কম্পন জাগে, অণুক্ষণ তেজ বিকীর্ণ করে সে আবার ফিরে যায় তার পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবিচলিত অবস্থায়। শব্দকে যেমন ঘণ্টার মূল-উপাদান বলা চলে না, বিকিরণকেও তেমনি পদার্থের মূল-উপাদান ব'লে ধরা হয়নি। কি করে সূর্য কোটি কোটি বছর ধরে একটানা তেজ বিকীর্ণ করে চলেছে, কেন তা কল্পনা করা অসম্ভব, এর থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। পরমাণুর বিক্ষোভেই সৃষ্টি হয় সূর্যের আলো এই ছিল বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, কিন্তু কোন শক্তি এই বিক্ষোভকে অব্যাহত রাখছে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।

পরমাণু বৈদ্যুতকণার সমষ্টি, এ-তথ্য জানার সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল। বৈদ্যুতকণা থেকে যত দূরেই যাই না কেন, তার আকর্ষণ-বিকর্ষণের সীমা পেরিয়ে যাওয়া যায় না। দেখতে পাই অন্তত একটা বিশেষ অর্থে ইলেকট্রন সমগ্র মহাশূন্যকে অধিকার করে রয়েছে। ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েল জিনিসটা আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছেন; বৈদ্যুৎকণাকে তাঁরা মনে করে নিয়েছিলেন অক্টোপাসের মতো ক্ষুদ্র জীব, দেহ থেকে যেন আকর্ষের (tentacles) জাল বিস্তার করে সমগ্র মহাশূন্যকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে, এই আকর্ষের নাম হল 'বল-রেখা' (Lines of Force)। বৈদ্যুতকণাদের পরস্পর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ঘটে তখনই, যখন তাদের দেহনিঃসৃত আকর্ষগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে যথাক্রমে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে। বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তির সমন্বয়ে এই

আকর্ষের সৃষ্টি এরূপ অনুমান করা হয়েছিল; বিকিরণ সৃষ্টির মূলেও এই দুটি শক্তি। পরমাণুর তেজ বিকিরণের অর্থ হল মহাশূন্যে তার কতকগুলি আকর্ষ বিস্তার করা; অনেকটা সজারুর পালক ত্যাগ করার মতোই। এই চিন্তাধারা বিকিরণ ও বস্তুকে আরও ঘনিষ্ঠ সূত্রে বেঁধে দিল।

সব রকমের বিকিরণই তেজের বিচিত্র প্রকাশ ব'লে, আইন্‌স্টাইনের সূত্র অনুসারে তারা হবে জড়মানের বাহন। পালক ঝেড়ে ফেলে দিলে সজারুর ওজন যেমন ঐ পরিত্যক্ত পালকের ওজনের সমমাত্রায় কমে যায়, ঠিক তেমনি তেজ বিকীর্ণ করলে পরমাণুর ওজনেরও হ্রাস ঘটে; এই কমতির মাত্রা বিকীর্ণ তেজের জড়মানের সমান। এক টুকরো কয়লা আগুনে পোড়ালে, তার ধোঁয়া ও অবশিষ্ট ছাইয়ের সম্মিলিত ওজনের সঙ্গে ঐ কয়লার ওজনের একটা অসঙ্গতি থেকে যায়; দহনে যে তাপ ও আলোর সৃষ্টি হয় তাদের ওজন, ছাই ও ধোঁয়ার ওজনের সঙ্গে যোগ করলে তবে কয়লার টুকরোর পূর্ব ওজনের সমান হবে।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করলেন, বিকিরণ কোনো ক্ষেত্রতলে পতিত হলে একটা চাপের সৃষ্টি করে। বিকিরণ জড়মাত্রার বাহন, এই তথ্যেরই স্বাভাবিক পরিণতি হল এই ঘটনা; আলোকরশ্মির উপাদান হল জড়মান, তার গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান—সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। লেবেডিউ (Lebedew) পরে এই বিকিরণ চাপের সন্ধান পান; নিকল্‌সের পরীক্ষায় জানা গেল যে এই চাপমাত্রা ম্যাক্সওয়েল নির্ধারিত চাপমাত্রার সমতুল্য। উজ্জ্বল আলোর তেজের সংঘাতে বস্তুপদার্থ পিছন দিকে সরে যাবার কথা, মনে হবে যেন তার উপর বন্দুকের গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু যে-আলো এসে পৃথিবীকে আঘাত করে তার মাত্রা অত্যধিক কম। এই ঘটনার পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে হলে, পৃথিবী ও তার পরীক্ষাগারে সংগঠিত

পদার্থবিজ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে, দৃষ্টিপাত করতে হবে মহাশূন্যে ও বিস্তৃততর পদার্থবিজ্ঞানের দিকে, নক্ষত্রলোকের বিপুল তেজভাণ্ডারে নিয়ত যার ক্রিয়া চলেছে। সূর্য বা সাধারণ নক্ষত্রের কেন্দ্রে উষ্ণতার মাত্রা প্রায় ৫ কোটি ডিগ্রি; ৬ ইঞ্চি ব্যাসের একটি কামানের গোলাকে এই দুঃসম্ভব তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে, যে-তেজ সে বিকীর্ণ করবে, তার সংঘাতে, ৫০ মাইল দূরত্বমাত্রার মধ্যে যে কোনো লোক ধরাশায়ী হবে। বস্তুতঃ নক্ষত্রের অন্তর্কেন্দ্রে বিকিরণ-চাপ এত প্রচণ্ড যে নক্ষত্রের ওজনের অনেকখানিই সে বহন করে।

হিসেব করে দেখা গেছে যে-সূর্যরশ্মি প্রতি মিনিটে এক বর্গমাইল স্থানের উপর সোজা এসে পড়ে তার ওজন এক আউন্সের ১০ হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। আলোর গতি নিয়ে সে আঘাত করে পৃথিবীকে, প্রতিহত হয়ে তার গতি নিঃশেষ হলে যে চাপের সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ বায়ুমণ্ডলের চাপের দুহাজার পাঁচশো কোটি ভাগের একভাগ (·০০০, ০০০, ০০০, ০৪ গুণ)। মাত্রা ক্ষুদ্রতায় এই সংখ্যা প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে। প্রবল বৃষ্টিতে এক সেকেণ্ডের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ সময়ে যে পরিমাণ জল পড়ে, এক শতাব্দীর সূর্যকিরণ বর্ষণের ওজন তার চেয়েও কম। বিকিরণ-চাপের মাত্রা এত কম হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, জ্যোতির্লোকের ব্যাপ্তির তুলনায় এক বর্গমাইল স্থান অতি নগণ্য। প্রতি মিনিটে মোট যে-তেজ সূর্য থেকে নিঃসৃত হয় তার ওজন হল ২৫ কোটি টন; লণ্ডন সেতুর নিচে দিয়ে মোটামুটি যে-হারে জল প্রবাহিত হয়, এই সৌরবিকিরণ ওজনে তার প্রায় ১০,০০০ গুণ। যদি দেখি এই ১০,০০০ সংখ্যাটা ভুল, তাহলে তার কারণ এই নয় যে সৌরবিকিরণের নিখুঁত ওজন আমরা নির্দেশ করতে পারিনি; বরং একথাই বলব যে টেম্‌স্ নদীর জল প্রবাহের নিখুঁত পরিমাপ আমাদের জানা নেই। পৃথিবীর

জলবিজ্ঞানের (Hydraulics) চেয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেক বেশি নিখুঁত।

অন্যান্য নক্ষত্র থেকে খানিকটা তেজ সূর্যের উপর পড়ে, কিন্তু সূর্যপৃষ্ঠ থেকে যে-ওজনের তেজ নিঃসৃত হয় তার তুলনায় এ-সব নক্ষত্র থেকে আগত তেজের ওজন অতি অকিঞ্চিৎকর; কাজেই বাইরে থেকে প্রতিমিনিটে ২৫ কোটি টন বস্তুপদার্থ সূর্যে প্রবেশ করলে তবে সে তার ওজন রক্ষা করতে পারবে।

মহাশূন্যে চলার পথে সূর্য ক্রমাগত অণু, পরমাণু, ধূলিকণা ও উল্কাজাতীয় নানাবিধ মুক্ত বস্তুকণা আত্মসাৎ করতে থাকে। উল্কা হল ক্ষুদ্র কঠিন বস্তু, বিপুল সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে সৌরমণ্ডলে; গ্রহমণ্ডলীর মতোই আপন আপন কক্ষপথে তারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কখনও বা তারা মহাবেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে বায়ুর বস্তুকণার সংঘাতে অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন কতকগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। সাধারণত পৃথিবীতে পৌঁছবার পূর্বেই তারা বাষ্পীভূত হয়ে মিলিয়ে যায়; কদাচিৎ দু-একটি বৃহদায়তনের উল্কা বায়ু-প্রতিরোধের বিঘটনকারী শক্তির (disintegrating effect) হাত এড়িয়ে প্রস্তরখণ্ড রূপে এসে পৃথিবীপৃষ্ঠে আঘাত করে; এদেরই নাম উল্কা-পিণ্ড (meteorite), সময় সময় আয়তনে এরা প্রকাণ্ড বড় হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সাইবিরিয়াতে এক উল্কাপাতের ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, তাতে এক প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি হয়ে বড় বড় বনকে বিধ্বস্ত করে; মাটির সঙ্গে এর সংঘাতে এমন এক প্রবল ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল যে তার স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানে। আমেরিকার অ্যারিজোনা প্রদেশে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, এক বৃহত্তর উল্কাপাতের ফলে ৩ মাইল পরিধিযুক্ত

এক প্রকাণ্ড গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে ; কিন্তু এ-সব দানবাকৃতি উল্কা অত্যন্ত বিরল, সাধারণ উল্কা-পিণ্ড অতি ছোট, মটরদানার চেয়ে বেশি বড় নয়।

শ্যাপ্‌লি (Shapley) হিসেব করে দেখেছেন যে প্রতিদিন বহুকোটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ; এদের প্রত্যেকটি, বাষ্প ও ধূলিকণায় পরিণত হয়, পথিবীর ওজন দেয় বাড়িয়ে। সূর্যকে আঘাত করে এর চেয়ে বহু বহুসংখ্যক বেশি উল্কাপিণ্ড, প্রতি সেকেণ্ডে বহুকোটি ; সম্ভবত এই বিচ্ছিন্ন বস্তুকণার দানেই সূর্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হতে থাকে। শ্যাপ্‌লির হিসেব থেকে জানা গেছে, প্রতি সেকেণ্ডে যে-উল্কার দল সূর্যে এসে পৌঁছয় তাদের সম্মিলিত ওজন ২০০০ টনের বেশি নয় ; তেজ-বিকিরণে প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের যে-ওজন হ্রাস পায় উল্কার দলের এই ওজন তার দুহাজার ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। তাই একথা প্রায় নিশ্চিত ব'লেই মনে হয় যে, আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকাশের পরেও প্রতি মিনিটে সূর্যের ওজন হ্রাস হচ্ছে ২৫ কোটি টনের কাছাকাছি ; এ-যেন একটা ক্ষয়িষ্ণু রচনা (Wasting Structure), ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, উপসাগর স্রোতে (Gulf Stream) হিমশৈলের মতো যেন গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অন্য কোনো নক্ষত্র এর ব্যতিক্রম নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের বিশেষ মিল আছে। কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ না থাকলেও সঞ্চিত বহু তথ্য এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে প্রবীন নক্ষত্রের চেয়ে নবীন নক্ষত্রের দল ওজনে ভারি। এদের ওজনের ভেদ শুধু কয়েক কোটি টন নয়, ওজনের বাড়াবাড়িতে নবীন প্রবীনকে ছাড়িয়ে যায় ১০, ৫০ এমন কি ১০০ গুণ পর্যন্ত। এই ওজনভেদের সব চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হল এই যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নক্ষত্রের দল তাদের বেশির ভাগ ওজনই নিঃশেষ করে ফেলে। সহজ হিসেব

থেকে দেখা যায়, সূর্য প্রতি মিনিটে ২৫ কোটি টন ওজন হারালেও তার বেশির ভাগ ওজন নিঃশেষ হতে লাগবে কোটি কোটি বছর। সব নক্ষত্রের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য ব'লে নক্ষত্রমণ্ডলীর জীবদ্দশার কাল নির্দিষ্ট হয়েছে কোটি কোটি বছর। কিন্তু এদের ভাণ্ডার এতো বৃহৎ যে আরো বহুকোটি বছর এরূপ অপব্যয়ের উদ্দামতা চলতে পারবে।

অন্য উপায়েও নক্ষত্রের আয়ুষ্কাল নির্ণয় করা যায়। একটি উপায়ের কথা বিশেষ করে বলা যাক, নক্ষত্রদলের অতিপ্রাচীনতার কথা ঘোষণা করে মহাশূন্যে তাদের গতি, এই গতিই তাদের স্থিতিকাল নির্দেশ করছে কোটি কোটি বছর। একথা বলা হয়েছে, যে-দূরত্বমাত্রা অধিকার করে নক্ষত্রদলের পরস্পর অবস্থান, তাতে তাদের অতিশয় কাছে আসা বা গায়ে পড়া একটা দুঃসম্ভব ঘটনা। কিন্তু কোটি কোটি বছরের পরমায়ু নিয়ে যখন তাদের জীবন তখন প্রত্যেক নক্ষত্রেরই, কয়েকবার অন্তত অপর নক্ষত্রের কাছাকাছি আসা উচিত ছিল; এই অবস্থায় তাদের পরস্পর মহাকর্ষের টান এত প্রবল হয় না যাতে কোনো নক্ষত্রেরই দেহ থেকে বস্তুপদার্থ ছিঁড়ে বের হয়ে এসে গ্রহলোকের সৃষ্টি করতে পারে। টানের চোটে তাদের নির্ধারিত কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতি ও গতিমাত্রার ভেদ ঘটতে পারে মাত্র। জুড়ি-নক্ষত্রেরা (Binary Systems) ভারাবর্তনের জালে ধরা পড়ে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে দুটি বিভিন্ন কক্ষপথে; নিকটবর্তী কোনো নক্ষত্রের মহাকর্ষের টান এদের যুগলযাত্রার কক্ষপথের পুনর্ব্যবস্থা ঘটাবে মাত্র।

এ-সব পরিণাম বিশদভাবে হিসেব করা যায়, কাজেই নক্ষত্রের আয়ুষ্কাল যদি সত্যিই কোটি কোটি-বছরের বিপুল কালমাত্রা অধিকার করে থাকে, তাহলে সম্ভাব্য যা-কিছু ঘটনা সবই আমরা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করতে পারি। যা-কিছু খোঁজ করব সবই নক্ষত্রবিশ্বে পাওয়া যাবে, পূর্বাহ্নে

অনুমিত সব পরিণামই সেখানে বর্তমান ; আর যতদূর বলতে পারি, তাদের বিপুল পরিমাণ এই নির্দেশ দিচ্ছে যে নক্ষত্রের আয়ুষ্কাল কোটি কোটি বছর।

একটা প্রতিকূল সিদ্ধান্ত এই চিন্তাধারাকে ব্যাহত করে সম্পূর্ণ পৃথক এক উপসংহারের নির্দেশ দিচ্ছে। বিষয় অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য, আপেক্ষিক-বাদের সব চেয়ে জটিল অংশে নিবদ্ধ ; তা হলেও এর একটা মোটামুটি বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার।

পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব—আপেক্ষিকবাদের মতে মহাশূন্য বাঁকা, অনেকটা পৃথিবীপৃষ্ঠের মতোই। আলোকরশ্মির বক্রতা (সূর্যগ্রহণে যার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে) ও গ্রহ ধূমকেতুর কক্ষপথের বক্রতার (মহাকর্ষের শক্তির উপর যা আরোপ করা হতো) মূল কারণ হল মহাকাশের এই বাঁকানো-ধর্ম (The curvature of space)। এই মতবাদ অনুসারে, বস্তুমাত্রের উপস্থিতি আকাশকে বাঁকিয়ে দেয়, কোনো 'শক্তির' সৃষ্টি করে না, যাকে আকর্ষণ ব'লে থাকি সেটা কোনো শক্তিই নয়, একটা ভ্রান্তধারণা মাত্র ; আকাশের বাঁকানো-ধর্মেরই প্রকাশ মহাকর্ষে। একটি একটি করে সব বাধাবিঘ্ন চোখের সামনে ধরা যাক, মনে করা যাক বস্তুপদার্থের উপস্থিতিই আকাশকে বাঁকিয়ে দেবার একমাত্র কারণ। তাহলে বস্তুহীন কোনো শূন্য-বিশ্বের (Empty Universe) বক্রতা থাকবে না, কারণ তাকে বাঁকাতে পারে এমন কোনো বস্তুকণাও নেই ; এরূপ শূন্য-বিশ্বের আয়তন হবে অসীম। কিন্তু বিশ্ব তো বস্তুশূন্য নয়, তাই তার আয়তন নির্দিষ্ট হবে তার অন্তর্ভূত বস্তুপদার্থের পরিমাণ দিয়ে। বিশ্বে বস্তুর পরিমাণ যত বাড়তে থাকবে মহাশূন্যের বক্রতাও ততই বেড়ে চলবে, দ্রুততর গতিতে সে নিজেরই উপর নিজে বেঁকে পড়বে (bend back on itself); এর পরিণাম দাঁড়াবে এই যে

বিশ্বের আয়তন ক্রমাগত ছোট হতে থাকবে, যেমন দ্রুত ও ধীরে বেঁকছে এরূপ দুটি বৃত্তের মধ্যে প্রথমটি হবে অপেক্ষাকৃত ছোট।

সাবানের বুদবুদকে বৈদ্যুত আশ্রিত করার সুপরিচিত পরীক্ষা হয়তো পূর্বোক্ত যুক্তিকে অধিকতর সহজবোধ্য করবে। বিদ্যুৎ-উৎপাদক-যন্ত্রের (Electrical Machine) প্লেটের উপর একটি বুদবুদকে রেখে ধীরে ধীরে যন্ত্রের কাজ আরম্ভ করলে, বুদবুদটির উপর উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হতে থাকে; তাতে ফেঁপে উঠতে উঠতে অবশেষে সে ফেটে যায়। এ-ক্ষেত্রে বুদবুদকে (তার ফেটে যাওয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে) বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হল; বিশ্বের আয়তন যেমন তার অন্তর্গত বস্তুপদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, বুদবুদের আয়তনও ঠিক তেমনি নির্ভর করে তার মধ্যে সঞ্চিত বৈদ্যুতের পরিমাণের উপর। তাহলেও এদের মধ্যে দুটি মূল প্রভেদ রয়েছে—প্রথমত, বুদবুদের গঠনতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে একটা সহজাত বক্রতা, তাই সম্পূর্ণ বৈদ্যুতহীন হলেও তার একটা নির্দিষ্ট আয়তন থাকবে; কিন্তু একেবারে বস্তুহীন হলে বিশ্বের আয়তন হবে অসীম। দ্বিতীয়ত, 'বৈদ্যুতের পরিমাণ বাড়ালে' বুদবুদের আয়তনও সেই সঙ্গে 'বেড়ে' যায়, কিন্তু 'বস্তুপরিমাণ বাড়ালে' বিশ্বের আয়তন 'ছোট' হয়ে যায়—বস্তুমাত্রা যতই বাড়তে থাকবে তার ধারণযোগ্য স্থানের পরিসর ততই কমে আসবে।

বিশ্বকে অনেকটা ঠিক বুদবুদের মতো কল্পনা করে আইন্‌স্টাইন এই শেষোক্ত বাধা ও অন্যান্য জটিলতার সমাধান করতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, বস্তুর উপস্থিতি ছাড়াও বিশ্বলোকের এমন একটা সহজাত বক্রতা রয়েছে যাতে বস্তুমাত্রার বৃদ্ধিতে তার আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে।

এ-সত্ত্বেও, আরো একটা মস্ত প্রভেদ রয়ে গেছে। মহাশূন্যে সংস্থিত বস্তুসংঘ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, কিন্তু বুদবুদের উপরে সঞ্চিত বৈদ্যুতের

দল পরস্পরকে বিকর্ষণ করে; কারণ জাতে পজিটিভই হোক বা নিগেটিভই হোক, বুদবুদের উপর সব সময় থাকে সমধর্মী বৈদ্যুত। তাই বৈদ্যুত আশ্রিত বুদবুদ একটি নিখুঁত স্থায়ীরচনার প্রতীক। সামান্য মাত্রায় বৈদ্যুত যোগ করলে বুদবুদটি, এতটুকু বিক্ষুব্ধ না হয়ে, সামান্য বিস্ফারিত হয়ে এক নূতন সাম্যস্থিতি (equilibrium) গ্রহণ করে। একটু নাড়া দিলে কিছুক্ষণ সে কাঁপতে থাকে, তারপর আবার স্থির হয়ে যায়। কিন্তু আকর্ষণ ও বিকর্ষণে প্রভেদ আছে ব'লেই আকর্ষণশীল বৈদ্যুত আশ্রিত বুদবুদ হবে অস্থায়ী; গণিতবেত্তা সহজেই বুঝতে পারবেন কেন এরূপ ঘটবে। তুলনার ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক সাবানের বুদবুদ ও বিশ্বলোকের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকলেও সম্প্রতি বেলজিয়ন গণিতবেত্তা আবে লমাইতের (Abbé Lemaitre) প্রমাণ করেছেন যে এরূপ তুলনা চলতে পারে। আর যে-ধরনের বিশ্বের কথা এখানে আলোচনা করছি তার কোনো স্থায়ীত্ব নেই, বেশিক্ষণ সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না, মুহূর্তেই তার স্থৈর্যের বাঁধন যাবে শিথিল হয়ে; সঙ্গে সঙ্গে সে বিস্ফারিত হতে হতে অসীমের কাছ-ঘেঁষা দুষ্পরিমেয় আয়তনে গিয়ে পৌঁছবে, আর তা না হলে সংকুচিত হতে হতে ক্ষুদ্রতম বিন্দুতে গিয়ে ঠেকবে। কাজেই কোনো প্রাচীন-বিশ্বের (Aged Universe)-অন্তর্ভূত মহাশূন্য হবে বিস্ফারণশীল, না হয় সংকোচনশীল; আর তার অন্তর্গত বস্তুপদার্থের দল বিপুল বেগে কেবলই দূরে সরে যেতে থাকবে, না হয় পরস্পর নিকটতর হতে থাকবে।

বিশ্বের আয়তন নির্ভর করে তার অন্তর্গত বস্তুপদার্থের পরিমাণের উপর —আইন্‌স্টাইনের এই মতবাদকে মূল ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে লমাইতেরের যুক্তি। এর পূর্বে, বিশ্বছবি সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ পৃথক মত প্রচার করেন লাইডেন-এর (Leiden) অধ্যাপক ডি সিটর (de

Sitter)। আইন্‌স্টাইনের মতো তিনিও অনুমান করেছেন যে বিশ্বের খানিকটা বক্রতা রয়েছে, দেশ ও কালের সহজাত ধর্মই এই গুণ তার উপর আরোপ করেছে। বস্তুপদার্থের উপস্থিতি এই বক্রতার মাত্রাকে আরও একটু বাড়িয়ে দিয়েছে ; কিন্তু বিশ্বের বস্তুসংঘ ভিড় করে নেই, পরস্পরের কাছ থেকে অত্যন্তই দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে, তাই দেশ-কালের মূল প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বক্রতার তুলনায় বস্তুর উপস্থিতিজনিত অতিরিক্ত বক্রতার মাত্রা অতি নগণ্য। গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে ডি সিটর তাঁর কল্পিত বিশ্বের গুণ বিচার করে দেখলেন যে এই বিশ্বের অন্তর্ভূত মহাশূন্যেরও বিস্ফারণ বা সংকোচনের একটা ঝোঁক আছে, আর তার অন্তর্গত বস্তুপদার্থেরও পরস্পর দূরে সরে যাবার বা কাছাকাছি আসার একটা ঝোঁক আছে।

প্রথমত ডি সিটর ও আইন্‌স্টাইন-বিশ্বকে পরস্পর বিরোধী ব'লে মনে হতো ; গণিতবেত্তা এর একটা মীমাংসার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন। কিন্তু লেমাইতারের বর্তমান আলোচনা থেকে জানা গেছে,এই মতবাদ দুটি যতটা পরস্পর বিরোধী তার চেয়ে বেশি অনুপূরক (complementary)। আইন্‌স্টাইন প্রবর্তিত বিশ্ব যতই বিস্ফারিত হতে থাকে, তার অন্তর্ভূত বস্তুপদার্থও ততই দূরে সরে যায়, অবশেষে তার পরিসমাপ্তি ঘটে ডি সিটর প্রবর্তিত শূন্যবিশ্বে। আইন্‌স্টাইন ও ডি সিটরের এই দুটি বিশ্বকে একটি শেকলের দুই প্রান্তে অবস্থিত ব'লে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তারা পরস্পর বিরোধী এরূপ অনুমান করা ভুল হবে। তারা শুধু সম্ভাব্য বিশ্বের (possible universes) সীমা নির্দেশ করে, আর যে-বিশ্ব এই শেকলের আইন্‌স্টাইন-প্রান্তে (Einstein-end) যাত্রা শুরু করে, সে ধীরে ধীরে শেকলের দৈর্ঘ্য পার হয়ে ডি সিটর-প্রান্তে গিয়ে পৌঁছয়। আমাদের বিশ্ব এই বিশ্বেরই ছাঁচে গড়া হলে, শেকলের কোন

প্রান্তে তার বর্তমান অবস্থিতি এই প্রশ্ন না করে, শেকল ধরে সে কতদূর এগিয়ে গেছে সেই প্রশ্ন করাই যুক্তিসঙ্গত।

শেকলের দুই প্রান্তে অবস্থিত এই দুটি আদর্শ-বিশ্বের মধ্যে এই সামঞ্জস্য রয়েছে যে, উভয়ের অন্তর্ভূত বস্তুসংঘ, হয় দূরে সরে যাবে না হয় কাছাকাছি আসবে। শুধু দুই প্রান্তে নয়, আগাগোড়া সমস্ত শেকলটা জুড়েই এই ব্যাপার ঘটবে। আপেক্ষিকবাদ অনুযায়ী যদি এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে (একথা প্রায় নিশ্চিত) তাহলে তার অন্তর্ভূত বস্তুপদার্থের পরস্পর দূরত্বমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলবে, আর তা না হলে কমতে থাকবে।

এই সিদ্ধান্ত অনেকের মনেই বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছে, কারণ কয়েক বছর হল জানা গেছে যে দূরবর্তী কুণ্ডলী-পাকানো নীহারিকাগুলি (Spiral Nebulae) প্রচণ্ড গতিতে আমাদের পৃথিবীর কাছে থেকে কেবলি দূরে সরে যাচ্ছে ; যাদের দূরত্বমাত্রা যত বেশি তাদের গতিবেগও তত বেশি। মাউণ্ট উইলসন চূড়ায় রক্ষিত ১০০ ইঞ্চি দুরবীনের সাহায্যে যে-সর্বদূরবর্তী নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে তার গতিবেগ অতি বিপুল, সেকেণ্ডে ১৫,০০০ মাইল। ডক্টর হাব্‌ল্ ও হুমাসন্ (Dr. Hubble and Dr. Humason) নীহারিকার গতিবেগ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করে স্থির করেছেন, যে-গতিতে নীহারিকার দল দূরে সরে যাচ্ছে তা মোটামুটি তাদের দূরত্বমাত্রার অনুপাতিক ; বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে আপেক্ষিকবাদের নির্দেশ নির্ভুল হলে নীহারিকার গতি ও দূরত্বের সম্বন্ধ এরূপ হওয়াই সঙ্গত। যে-নীহারিকার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে লাগে এক কোটি বছর তার গতি সেকেণ্ডে প্রায় ৯০০ মাইল, আর সব নীহারিকার গতি তাদের দূরত্বের মোটামুটি সমানুপাতিক। ১নং প্লেটে যে-সব নীহারিকার ছবি তোলা হয়েছে, তাদের ছড়িয়ে-দেওয়া আলো

১ নম্বর প্লেট : মহাশূন্যের সুদূর প্রদেশ
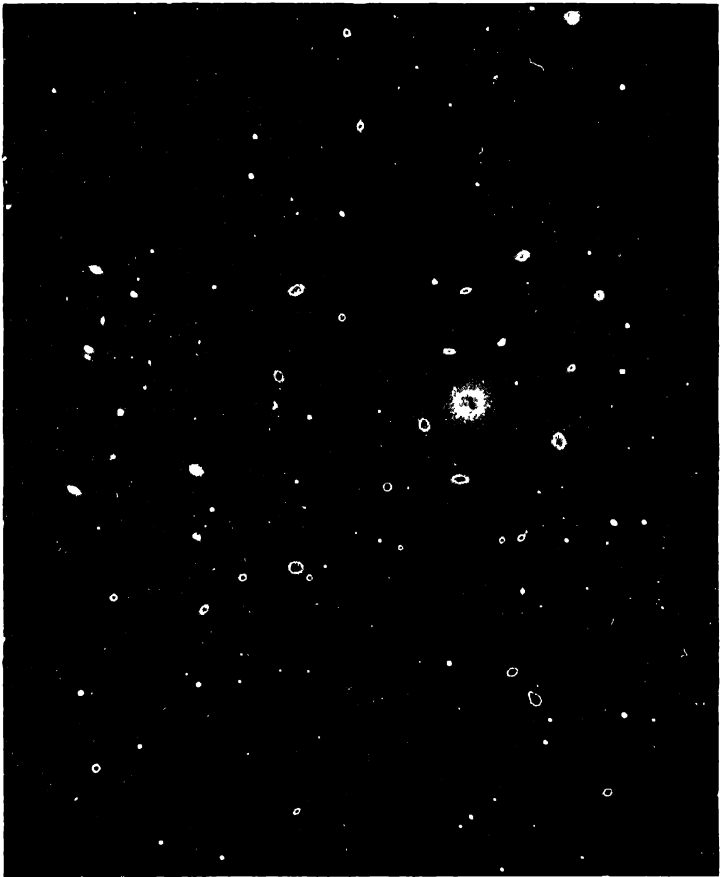
'কোমা বারনিসেস্' (*Coma Berenices*) নাক্ষত্রপ্রদেশে নীহারিকাপুঞ্জ

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীনের সাহায্যে (মাউণ্ট উইলসনে সংস্থাপিত ১০০ইঞ্চি দূরবীন) আকাশ-গোলকের এক অতি ক্ষুদ্র প্রদেশের ফোটোগ্রাফ। এর অধিকাংশ জ্যোতিষ্কই নীহারিকা; এমন বিপুল তাদের দূরত্বমাত্রা যে তাদের ছড়িয়ে-দেওয়া আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে লাগে ৫ কোটি বছর। প্রত্যেকটি নীহারিকাই আবার কোটি কোটি নক্ষত্র বা তাদের বস্তুমাত্রার সমাবেশ। এরূপ ২০লক্ষ নীহারিকার ছবি তোলা যেতে পারে, হয়তো দূরবীনের দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নীহারিকা।

২ নম্বর প্লেট : আলোক ও ইলেকট্রনের বিক্ষেপণ বা অপবর্তন

১ নম্বর ছবি : অনচ্ছ পর্দায় সূক্ষ্ম ছিদ্রেব মধ্য দিয়ে আলোকের পরিচলনে বিক্ষেপণ-বৃত্তের সৃষ্টি। (এল্. আর. উইলবারফোর্স)

২ নম্বর ছবি : সূক্ষ্ম সোনার পাতেব এক অতি ক্ষুদ্র অংশকে ভেদ করবার ফলে ইলেকট্রনেব বিক্ষেপণ-বৃত্ত সৃষ্টি। (জি. পি. টমসন)
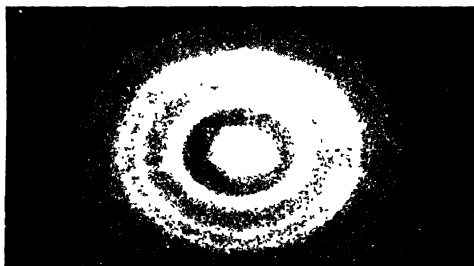
৩ নম্বর ছবি : সোনাব পাতের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ থেকে প্রতিফলনে ইলেকট্রনের বিক্ষেপণ-বৃত্ত সৃষ্টি। (জি. পি. টমসন)

পৃথিবীতে পৌঁছতে লাগে ৫ কোটি বছর, আর তাদের দূরে সরে যাবার গতি হল সেকেণ্ডে ৪৫০০ মাইল।

এই সংখ্যাগুলি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ কল্পনায় এ-সব নীহারিকার গতি বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিলে দেখা যাবে যে কয়েকশো কোটি বছর পূর্বে এরা ছিল সূর্যেরই খুব নিকট প্রতিবেশী। এর থেকে এই আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, এমন এক ক্রমবর্ধমান বিশ্বে আমাদের বাস যার বিস্ফারণ শুরু হয়েছে মাত্র কয়েকশো কোটি বছর আগে।

বিশ্ব-ইতিহাসের এখানেই যদি দাঁড়ি টানতে হয়, তাহলে নক্ষত্রের স্থিতি-কাল কোটি কোটি বছর, একথা স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে; এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে নক্ষত্রের দল কোটি কোটি বছর ধরে ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় করে ছিল বা ক্ষুদ্র স্থানমাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল, আর তাদের স্থিতিকালের সহস্রভাগের মাত্র শেষ অংশে আরম্ভ হয়েছে তাদের বিক্ষেপণের পালা। এদের দূরে সরে যাবার গতি শেষ পর্যন্ত যদি সত্য ব'লেই প্রমাণ হয়ে যায়, তাহলে বিশ্বের আয়ুষ্কাল কয়েকশো কোটি বছরের বেশি নির্দেশ করা সম্ভব হবে না।

নীহারিকার এই বিপুল গতি যথার্থ কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সোজাসুজি কোনো পরিমাপ থেকে এই গতি নির্ধারিত হয়নি, ডপ্‌লারের সূত্র (Doppler's Principle) প্রয়োগ করে তার মাত্রা হিসেব করা হয়েছে। সকলেরই জানা আছে, মোটরগাড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে তার শিঙের আওয়াজে যে-সুর কানে বাজে, সে দূরে সরে যেতে থাকলে তার চেয়ে নিম্ন সুর ধ্বনিত হয়। আলো সম্বন্ধেও ঠিক একথাই খাটে। কোনো জ্যোতির্ময় পদার্থ কাছে এগিয়ে এলে যে-রঙের আলো তার কাছ থেকে এসে পৌঁছয়, সে দূরে সরে গেলে ঐ আলোর রঙ অপেক্ষাকৃত লাল ব'লে মনে হয়; আলোর

ক্ষেত্রে রঙ ও শব্দের ক্ষেত্রে স্থর, আচরণে এদের বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। পরিস্ফুট বর্ণরেখার রঙের (colour of well-defined spectral lines) নিখুঁত পরিমাপ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব'লে দিতে পারেন এই জ্যোতির্ময় বস্তু আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, না দূরে সরে যাচ্ছে। বর্ণরেখার স্থানচ্যুতির মাত্রা থেকে এই পদার্থের গতির মাত্রাও হিসেব করে স্থির করা যায়। জ্যোতির্ময় পদার্থের গতির সংকেত নিহিত রয়েছে তার বিশ্লিষ্ট আলোর বর্ণরেখার স্থান পরিবর্তনের মধ্যে। দূরবর্তী নীহারিকার দল যে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে এরূপ অনুমান করার একমাত্র কারণ হল তাদের বিকীর্ণ আলোর রঙ, সাধারণ অবস্থায় যা হবার কথা, তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত লাল ব'লে মনে হয়।

কিন্তু গতি ছাড়া অন্য উপসর্গও আলোকে লাল রঙের দিকে ঠেলে দিতে পারে—যেমন, শুধু সূর্যের ওজনেই তার আলোর রঙ লাল হয়, সৌর-মণ্ডলের চাপে এই রঙ হয় অধিকতর লাল; পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের ফলে (যদিও পৃথক ভাবে) আরো বেশি লাল হয়, সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে তার পরিচয় পাই। পৃথক জাতীয় কতকগুলি নক্ষত্রের আলোর রঙ যে কী করে লাল হল তার রহস্য আজও জানা যায়নি। আবার, বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ডি সিটরের মতবাদ থেকে জানা গেছে যে কেবলমাত্র দূরত্বই আলোকে লাল রঙে পরিণত করতে পারে; কাজেই আকাশের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত নীহারিকার দল সম্পূর্ণ গতিহীন হলেও, কেবলমাত্র দূরত্বের জন্যই, তাদের আলোর রঙ অতিরিক্ত লাল হতে পারে। তাতে এরূপ অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে এই জ্যোতিষ্কের দল আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যে-সব কারণের কথা উল্লেখ করা হল তাদের একটিও নীহারিকার আলোর লাল রঙের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়, কিন্তু অল্প কিছুদিন হল ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউটের ডক্টর জুইকী

(Dr. Zwicky), নক্ষত্র ও নীহারিকার আলোকরশ্মি আকর্ষণের শক্তিকে, তার রঙ লাল হওয়ার আরো একটা কারণ ব'লে নির্দেশ করেছেন। এরূপ আকর্ষণের বলেই, সূর্যগ্রহণের সময়, আলোকরশ্মিকে তার সরল পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখা গেছে। কমটনের পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘাতে বিকিরণ, একই সঙ্গে, তার গতিপথ থেকে বিচ্যুত ও লাল রঙে পরিবর্তিত হয়। বিকিরণ যখন কোনো নক্ষত্র বা অন্য কোনো বস্তুপদার্থের মহাকর্ষের শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তখন সে তার নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়; জুইকীর মত অনুসারে তার আবার লাল রঙে পরিবর্তনও ঘটে।

এই মত যাচাই করতে কতকগুলি সমদূরবর্তী গোলাকার নীহারিকাগুচ্ছের (Globular Clusters) আলো পরীক্ষা করা হয়েছে। এমন ভাবে এদের বেছে নেওয়া হয়েছে যে দূরত্বের ভেদ না থাকলেও, পৃথিবী ও এদের অন্তর্বর্তী স্থানে মহাকর্ষের শক্তি প্রয়োগকারী বস্তুপদার্থের পরিমাণে বিপুল ভেদ থাকে। এদের ছড়িয়ে-দেওয়া আলোতে ঈষৎ লাল আভা দেখা গিয়েছে; মহাকাশের বিস্ফারণই যদি তার মূল কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তার মাত্রা সব নীহারিকাগুচ্ছেই সমান হবে। পরীক্ষায় এই সমতার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না, দেখা গেল লালের মাত্রা, ঠিক জুইকীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী পদার্থের পরিমাণের প্রায় অনুপাতিক; আর এর যথার্থ মাত্রা ও সূত্র-নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত গোলাকার নীহারিকাগুচ্ছ ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে, এরূপ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ব'লে কুণ্ডলী-পাকানো নীহারিকাদলের মহাদৌড়ের যুক্তিও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে; আলোর লাল রঙে পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা জুইকীর মতবাদ থেকে পাওয়া যায়।

নীহারিকার মহাদৌড়কে (recession) ভ্রান্ত ব'লে প্রতিপন্ন করতে আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ এসে হাজির হয়েছে। নিকটতম নীহারিকাদলের আলোর রঙ (সাধারণ অবস্থায় যা হওয়া উচিত তার চেয়ে) অপেক্ষাকৃত লাল না হয়ে বরং নীল হয়েছে ; আলো অপেক্ষাকৃত নীল দেখাবে যদি আলোর উৎস আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, তাই একথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে নিকটতম নীহারিকাদল আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে। আবার, নীহারিকার আপাতগতি তার দূরত্বমাত্রার সঙ্গে একেবারে সমানুপাতিক নয়—দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে-সব নীহারিকা ৭০ লক্ষ আলো-বছর (light-year) দূরত্বমাত্রায় অবস্থিত, সেকেণ্ডে ৬৪০ মাইল মোট গতিবেগের মধ্যে, তাদের গতিবেগের ভেদ গড়ে সেকেণ্ডে ২৪০ মাইল পর্যন্ত হতে দেখা গেছে।

যাই হোক, বিশ্ব-রচনার কাজ যদি উপরোক্ত পদ্ধতিতে ঘটে থাকে, তাহলে তার অন্তর্ভূত নীহারিকাদল নিঃসন্দেহে দূরে সরে যেতে থাকবে। এই মতবাদের যুক্তিধারার এই হল ন্যূনতম দাবী, কিন্তু নীহারিকার গতির মাত্রা তা নির্দেশ করে না। নীহারিকার বহির্গতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে, জুইকী ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর কার্যাবলী এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করে না ; যা তাদের সন্দেহ উদ্রেক করে তা হল লাল রঙের দিকে বর্ণরেখার স্থানচ্যুতির মাত্রা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী যে-গতি নির্ণয় করেছেন তা ঠিক নীহারিকার সেই বহির্গতি কিনা। সম্ভবত বর্ণরেখার স্থানপরিবর্তনের মাত্রার বেশির ভাগই নির্ভর করে জুইকী নির্ধারিত কারণ বা অনুরূপ কোনো কারণের উপর, অবশিষ্ট অতি সামান্য পরিমাণ এই যথার্থ বহির্গতির পরিচায়ক। এই গতির মাত্রা নির্ণয় করা অসম্ভব, কারণ বৃহত্তর প্রভাব ক্ষুদ্রতর প্রভাবকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এই সমস্যার আজ পর্যন্তও কোনো সমাধান হয়নি, কিন্তু জ্যোতিষ্কের এই

আপাত বহির্গতির বেশির ভাগই যদি অপ্রকৃত ব'লে একবার স্বীকার করা হয়, তাহলে যে-যুক্তিতে নক্ষত্রের স্থিতিকাল স্বল্প ব'লে ধরা হয়েছে তা যাবে একেবারে নিরর্থক হয়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দাবীর সমর্থনে, তাহলে আমরা স্বচ্ছন্দে নক্ষত্রলোকের উপর কোটি কোটি বছরের দীর্ঘ-জীবন আরোপ করতে পারি।

আগেই বলা হয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞান এই নির্দেশ দিচ্ছে যে সূর্য কোটি কোটি বছর ধরে, তার ভাণ্ডার থেকে, মিনিটে ২৫ কোটি টন বস্তুসম্বল তেজরূপে নিঃশেষ করে ফেলছে। হিসেব করে দেখা গেছে নবজাত সূর্যের ওজন ছিল বর্তমান সূর্যের বহুগুণ বেশি; নবীন নক্ষত্র প্রবীণ নক্ষত্রের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ভারি, জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই পরিক্ষীত সত্যের সঙ্গে এই তথ্য সামঞ্জস্য রক্ষা করছে। অপচয়ের বাড়াবাড়িতে, যে-বস্তুসম্বল তেজরূপে সূর্য এতদিন ধরে উজাড় করে দিয়েছে, জানি না তা কী করে তার মধ্যে সঞ্চিত ছিল!

সাধারণত ইলেকট্রন বা কোনো বৈদ্যুতকণার 'স্থির-জড়মান' তার 'তেজ-জড়মানের' চেয়ে অনেক বেশি; উষ্ণতার বাড়াবাড়ি ঘটলেই তেজ-জড়মানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সূর্যের অন্তর্কেন্দ্রে উষ্ণতার মাত্রা প্রায় ৫ কোটি ডিগ্রি, এমন কি সেখানেও তার সমগ্র বস্তুসম্বলের ২লক্ষ ভাগের এক ভাগ ছাড়া বাকি সবটাই স্থির-জড়মান দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। নবজাত সূর্যের তাপমাত্রা এর চেয়ে খুব বেশি ছিল একথা বলা চলে না, তাই সেই আদিম যুগের সূর্যের বস্তুসম্বলের বেশির ভাগই তার স্থির-জড়মান দিয়ে নির্ধারিত ব'লেই মনে হয়। তাই যদি হয় তাহলে একটি-মাত্র সিদ্ধান্তই সম্ভব—বর্তমান সূর্যের চেয়ে আদিম সূর্যের, পরমাণু ও ইলেকট্রন-প্রোটোনের সঞ্চয় ছিল অনেক বেশি। শুধু একটিমাত্র উপায়ে এই পরমাণুদলের অন্তর্ধান ঘটতে পারে, সে হল তাদের নিশ্চিত বিনাশ;

কোটি কোটি বছর ধরে যে-তেজ সূর্য ছড়িয়ে দিয়েছে, তার জড়মান এই বিনষ্ট পরমাণুদলের সম্মিলিত জড়মানের সমান।

এই যুক্তি খানিকটা অনিশ্চিত ব'লে মনে হতে পারে, কারণ পরীক্ষাগারের পদার্থবিজ্ঞানের সীমাবহির্ভূত তথ্য নিয়ে এর আলোচনা। সৌভাগ্যক্রমে অল্প কিছুদিন হল পদার্থবিজ্ঞান থেকে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা নিশ্চিত চরম সিদ্ধান্ত করতে না পারলেও এ-তথ্য সমর্থন করে যে, মহাশূন্যের গভীর প্রদেশে বিপুল পরিমাপে এই বস্তুধ্বংসের কাজ চলেছে। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে বস্তুপদার্থের যে-ধ্বংসলীলা চলেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়; কারণ এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত তেজ, অল্প কিছু দূর যেতে না যেতেই, নক্ষত্রের বস্তুপদার্থ আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, উষ্ণতার মাত্রা অনুযায়ী নক্ষত্র শেষ পর্যন্ত এই শোষিত তেজকে সাধারণ আলো ও উত্তাপ রূপে ছড়িয়ে দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যের গাণিতিক বিশ্লেষণ এই আভাস দেয় যে, তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের মতোই পরমাণু-ধ্বংসের প্রক্রিয়াও হয়তো স্বতঃউৎসারিত (spontaneous)। যদি তাই হয় তাহলে এই প্রক্রিয়া শুধু নক্ষত্রের উষ্ণ অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, যেখানেই প্রচুর পরিমাণে জ্যোতিষ্কের সমাবেশ সেইখানেই তার ক্রিয়া চলতে থাকবে।

একটিমাত্র ইলেকট্রন ও একটিমাত্র প্রোটোনের যুগপৎ ধ্বংসই এই প্রক্রিয়ার সব চেয়ে সাধারণ ঘটনা। এর একটা স্পষ্ট ছবি মনে আনা যায়, যদি ভাবি যে এই দুটি বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণা পরস্পর আকর্ষণের বলে, ক্রমবর্ধমান গতিবেগ নিয়ে ধাবিত হতে হতে অবশেষে সম্মিলিত হয়ে যায়; তাদের বিপরীতধর্মী বৈদ্যুত-যুগলের ক্রিয়া তখন সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়, আর তাদের সম্মিলিত তেজ একটি 'ফোটোন-রূপী' বিকিরণ শিখায় আত্মপ্রকাশ করে। পরমাণুর তেজবিকিরণের সময় কি করে তার জড়মান অক্ষুণ্ণ থাকে, একথা

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। পরমাণুকে তার জড়মাত্রার খানিকটা অংশ ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু তার বিনাশ ঘটে না ; ফোটোন তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে, আর তার প্রকাশ ঘটে ফোটোনের জড়মান রূপে। প্রোটোন-ইলেকট্রনের ধ্বংসকার্যে যে-ফোটোনের আবির্ভাব হয় তার জড়মান হবে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রোটোন-ইলেকট্রনের সম্মিলিত জড়মানের সমান। তাদের সম্মিলিত জড়মান অতি নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা হয়েছে, তার মাত্রা হল হাইড্রোজেন পরমাণুর জড়মানের একেবারে সমান। বস্তুধ্বংস যদি সত্যই ঘটে তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর জড়মানসম্পন্ন বহু সংখ্যক ফোটোন মহাশূন্যের পথে চলাফেরা করবে ; এদের কেউ কেউ এসে আঘাত করবে পৃথিবীকে।

এর চেয়ে বহুগুণ ভারি ফোটোনের আবির্ভাবও সম্ভব, কারণ যে-কোনো পরমাণু, হঠাৎ ধ্বংস হয়ে, তার সমগ্র তেজ ফোটোন রূপে মুক্ত করে দিতে পারে ; এই ফোটোনের জড়মান তখন হবে ঐ পরমাণুর জড়মানের সমান। একটি সম্ভাবনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুমাত্রের চরম উপাদান প্রোটোন ও ইলেকট্রন ; কিন্তু চারটি প্রোটোন ও দুটি ইলেকট্রনে মিলে এক অদ্ভুত ঘনসন্নিবিষ্ট বৈদ্যুতকণার সৃষ্টি হয়েছে, এর যেন একটা অভিনব পৃথক সত্ত্বা আছে। আল্‌ফা-কণা (*a-particle*) নামেই এর খ্যাতি, তেজস্ক্রিয় পাদার্থের বিকীর্ণ তেজের মধ্যেই শুধু এর সন্ধান মেলে। হাইড্রোজেন পরমাণুর পরেই সব চেয়ে সরল পরমাণু হল হিলিয়মের (Helium) ; তার কেন্দ্রবস্তুতে রয়েছে একটি আল্‌ফা-কণা, আর তাকে বৃত্তপথে প্রদক্ষিণ করছে দুটি ইলেকট্রন। একটি আল্‌ফা-কণার বৈদ্যুতসম্বল দুটি প্রোটোনের সম্মিলিত বৈদ্যুতের সমান, তাই দুটি ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলনে তার পূর্ণবিনাশ ঘটতে পারে ; এই ধ্বংস-ক্রিয়ায় যে-ফোটোনের উদ্ভব হবে তার জড়মান হবে, একটি হিলিয়ম পরমাণুর জড়মানের সমান।

এই উভয়জাতীয় ফোটোন, যে-কোনো সাধারণ বিকিরণের ফোটোনের চেয়ে জড়মানে অত্যধিক ভারি হবে ; ওজনের এই বৈশিষ্ট্য থেকে তাকে সহজেই চেনা যাবে। ফোটোনের দলকে প্রক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণের সঙ্গে তুলনা করা যায় ; তাদের প্রত্যেকটি চলে একটানা সমান গতিতে, এই গতিমাত্রা আলোর গতির সমান। একঝাঁক গুলি বন্দুক থেকে সমগতিতে প্রক্ষিপ্ত হলে এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভারি গুলির ক্ষতি করবার ক্ষমতা হবে বেশি, কাজেই বস্তুভেদের শক্তিও হবে অধিকতর প্রবল। নানা জাতীয় ফোটোনের ভিড় সম্বন্ধেও একথা খাটে ; যে-সব ফোটোনের জড়মান বেশি তাদের বস্তু ভেদ করবার শক্তিও সেই পরিমাণে বেশি। জড়মান থেকে ফোটোনের বাধা-ভেদ-শক্তি হিসেব করার একটি গাণিতিক সূত্র আছে ; এর থেকে দেখা গেছে, যে-সব ফোটোনের জড়মান হাইড্রোজেন বা হিলিয়ম পরমাণুর জড়মানের সমান তাদের বস্তু-ভেদ-শক্তি অপরিমিত।

'মহাজাগতিক রশ্মির' বস্তুভেদ করার প্রবল শক্তির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে ; মহাশূন্যের দূরবর্তী প্রদেশ থেকে এর আগমন, বিপুল উদ্যমে এসে আঘাত করে পৃথিবীকে। পুরু সীসের পাত কয়েক গজ পর্যন্ত ভেদ করতে পারে। বহুদিন পর্যন্ত এর মূল প্রকৃতি ছিল অজানা ; এই মহাআগন্তুক সত্যিকারের বিকিরণ, না ইলেকট্রনের বর্ষণ, এই নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম মতই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হত, কারণ কয়েক গজ পুরু সীসের পাত ভেদ করতে হলে ইলেকট্রনের দলকে এক অচিন্ত্যনীয় শক্তি নিয়ে চলতে হবে।

এই সমস্যার এখন সমাধান হয়েছে ব'লে মনে হয়। এই রশ্মি দূরবর্তী আকাশ থেকে আগত ইলেকট্রনের বর্ষণ হলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর, চুম্বকশক্তির প্রভাবে তাদের গতিবেগ পরিবর্তিত হবে। মহাজাগতিক রশ্মির বস্তু-ভেদ-শক্তি প্রদর্শন করতে পারে এরূপ প্রচণ্ড বেগ

নিয়ে ইলেকট্রনের দল চলতে থাকলে, হিসেব করে দেখা গেছে যে এই ইলেকট্রন-ধারা তাদের গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীকে আঘাত করবে তার যে-কোনো একটি চুম্বক-মেরুতে। কিন্তু এরূপ ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়নি; পৃথিবীর নানাস্থানে নানাবিজ্ঞানীর পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে এই রশ্মির প্রখরতা সর্বত্রই সমান। মেরুপ্রদেশ থেকে বহুদূরবর্তী স্থানে এই রশ্মির যে-প্রখরতা পরীক্ষায় নির্ধারিত হয়েছে, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ড থেকে প্রেরিত দক্ষিণ-মেরু অভিযানকারী বিজ্ঞানীর দল এই চুম্বক-মেরুর ২৫০ মাইলের মধ্যে ঠিক সেই প্রখরতাই লক্ষ্য করেছেন। এই পরীক্ষা থেকে একথা নিশ্চিত ব'লেই ধরা যেতে পারে যে এই মহা-জাগতিক রশ্মি যথার্থই বিকিরণ, ইলেকট্রন-বর্ষণ নয়। কাজেই পূর্বোক্ত সূত্র প্রয়োগ করে এই রশ্মির বস্তু-ভেদ-শক্তি থেকে তার ফোটোনদলের জড়মান নির্ণয় করা যাবে।

বিশেষ যত্ন ও দক্ষতার সহিত এই রশ্মির বস্তু-ভেদ-শক্তির পরিমাপ করেছেন পাসাডেনাতে (Pasadena) অধ্যাপক মিলিকন (Professor Millikan) ও তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীর দল, ষ্টুট্‌গার্টের অধ্যাপক রেগেনের (Professor Regener) ও আরও অনেকে। তাঁদের সকলেই দেখেছেন যে এই রশ্মি কতকগুলি বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন রশ্মির সংমিশ্রণ, অর্থাৎ বিভিন্ন জড়মান সম্পন্ন কতকগুলি ফোটোনের সমাবেশ। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, বাধাভেদকারী বিপুল শক্তি সম্পন্ন এর দুটি উপাদানই ফোটোন, যাদের জড়মান যথাক্রমে হিলিয়ম ও হাইড্রোজেন পরমাণুর জড়মানের প্রায় সমান; অর্থাৎ মহাশূন্যের দূরবর্তী প্রদেশে কোথাও প্রোটোন ও আল্‌ফা-কণার পূর্ণবিনষ্টি ঘটলে যে-জাতীয় ফোটোনের সৃষ্টি সম্ভব এই ফোটোন দুটিও ঠিক সেই জাতীয়। প্রোটোন ধ্বংস হতে পারে একটিমাত্র ইলেকট্রনের সংস্পর্শে তার বৈদ্যুত

ক্রিয়া প্রশমিত হলে, আর আল্‌ফা-কণার ধ্বংস ঘটবে একজোড়া ইলেকট্রনের সংস্পর্শে।

একথা বুঝিয়ে বলা দরকার যে ফোটোনের জড়মান একেবারে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায় না; কাজেই জোর করে বলা চলে না যে, ধ্বংসকার্যে যে-ফোটোন উদ্ভূত হওয়ার কথা এরা ঠিক সেই ফোটোনের দল। কিন্তু পরীক্ষায় যতদূর জানা গেছে এদের মধ্যে ভেদ নেই বললেই হয়; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সামঞ্জস্যের মাত্রাভেদ শতকরা ৫ ভাগের বেশি নয়, আর এই রশ্মির বস্তু-ভেদ-শক্তি এর চেয়ে বেশি নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এরূপ সামঞ্জস্যকে আকস্মিক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কাজেই একথা খুবই সম্ভব ব'লে মনে হয় যে প্রোটোন-ইলেকট্রনের ধ্বংস-ক্রিয়াই এই রশ্মির মূল উৎস।

কিন্তু এই ব্যাপারে এখনও বিতর্কের শেষ হয়নি; যে-মত এখানে প্রকাশ করা হল তা বিজ্ঞানীমহলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়নি। বিশেষ করে অধ্যাপক মিলিকন এই মত পোষণ করেন যে মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তি হয়তো হালকা পরমাণু থেকে ভারি পরমাণুর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়; পরমাণুর এই সৃষ্টিক্রিয়াকে তিনি 'বিশ্বস্রষ্টা এখনও সৃষ্টিকার্যে রত' এই তথ্যেরই সাক্ষ্য ব'লে মনে করেন।

একটি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মূল উপাদান (অর্থাৎ চারটি প্রোটন ও চারিটি ইলেকট্রন) রয়েছে হিলিয়মের পরমাণুতে, কিন্তু হিলিয়ম পরমাণুর জড়মান হল হাইড্রোজেন পরমাণুর জড়মানের ৩·৯৭ গুণ। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে কোনো রকমে সংহত করে একটি হিলিয়ম পরমাণু সৃষ্টি করতে পারলে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ·০৩ গুণ যে-অতিরিক্ত জড়মান অবশিষ্ট থাকবে তা রূপান্তরিত হবে বিকিরণে ও হাইড্রোজেন পরমাণুর শতকরা ৩ ভাগ জড়মান

বিশিষ্ট একটি ফোটোন 'মুক্ত হতে পারে'; মুক্ত হবে একথা বলা যায় না, কারণ কখনও চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোগে একটি হিলিয়ম পরমাণু গঠিত হলে যে-প্রক্রিয়ায় এই গঠনকার্য সমাধা হবে তা ঘটবে বিভিন্ন পর্যায়ে। কাজেই একটি বড় ফোটোন বিকীর্ণ না হয়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র জড়মান বিশিষ্ট ফোটোনের মুক্ত হবার কথা। এমন কি মুক্ত তেজের সবই যদি একটিমাত্র বড় ফোটোনে রূপান্তরিত হত তাহলেও তার বস্তু-ভেদ-শক্তি মহাজাগতিক-রশ্মির চেয়ে কম হত। একটা প্রবল বিক্ষোভে যদি ১২৯টি হাইড্রোজেন পরমাণু সংহত হয়ে একটিমাত্র জেননের (Xenon) পরমাণু সংগঠিত হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়ায় যে-ফোটোন উদ্ভূত হবে তার জড়মান হবে হাইড্রোজেন পরমাণুর জড়মানের প্রায় সমান; আর তার বস্তু-ভেদ-শক্তি হবে মহাজাগতিক রশ্মির দ্বিতীয় তীব্রতম উপাদানের সমতুল্য।

বিকিরণ সৃষ্টির এই মত মেনে নিলে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় যে এই রশ্মির অপেক্ষাকৃত কম তীব্র উপাদানগুলির উদ্ভব হবে, জেনন থেকে কম জটিল পরমাণুর সংযোগে। আবার এই রশ্মির তীব্রতম উপাদানটি অনতিক্রম্য বাধাবিঘ্ন এনে হাজির করে। যে-প্রক্রিয়ায় কতকগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু সংহত হয়ে একটি প্রকাণ্ড পরমাণু সংগঠিত হয়, এর ফোটোনগুলি যদি তার থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে এই বৃহৎ পরমাণুর পরমাণবিক ওজন (Atomic Weight) হতে হবে ৫০০-র কাছাকাছি; পরমাণবিক ওজনের এতটা আতিশয্য সম্ভাবনার সীমাকেও অতিক্রম করে যায়।

আবার একথাও সমান অসম্ভব ব'লে মনে হয় যে দ্বিতীয় তীব্রতম উপাদানের উদ্ভব হয়েছে জেনন বা তারই পরমাণবিক ওজনের সমতুল্য অন্য কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংগঠন প্রক্রিয়ায়, কারণ এ-সব

পরমাণু অত্যন্ত দুর্লভ। অপেক্ষাকৃত কম তীব্র উপাদানগুলির মূল উৎস যাই হোক না কেন, দুটি তীব্রতম উপাদানের মূল কারণ বস্তুধ্বংস ছাড়া আর কোনো প্রক্রিয়ার উপর আরোপ করা চলে না ব'লেই মনে করি।

বিপুল পরিমাণে এই রশ্মির বর্ষণ চলেছে পৃথিবীর উপর। মিলিকন ও ক্যামেরণ (Cameron) হিসেব করে দেখেছেন, সূর্যকে বাদ দিলে, সমগ্র নক্ষত্রলোক থেকে যে-সম্মিলিত বিকিরণ রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় মহাজাগতিক রশ্মির মাত্রা তার দশভাগের এক ভাগ। সমস্ত আকাশ জুড়ে এর সঞ্চরণ, ছায়াপথ পেরিয়ে মহাশূন্যের গভীরতম প্রদেশে এই বিপুল-তেজ সম্পন্ন তীব্র রশ্মির প্রাচুর্য পৃথিবীর উপর বর্ষিত রশ্মির সমতুল্য; কিন্তু সেখানে নক্ষত্রের আলোর পরিমাণ অনেক কম, কাজেই সমগ্র মহাকাশে সঞ্চরিত বিভিন্ন রশ্মির গড়মাত্রার হিসেব থেকে দেখা যায় যে বিশ্বলোকে মহাজাগতিক রশ্মিই সম্ভবত সব চেয়ে সাধারণ জাতের বিকিরণ।

এই রশ্মির বিপুল পরিমাণ আংশিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তার প্রবল বস্তু-ভেদ-শক্তি থেকে; এই শক্তিই একে অক্ষয় করে রেখেছে। জলে স্থলে আকাশে সকল পদার্থেই এর প্রবেশ; মহাশূন্যের পথে কোটি কোটি বছর ধরে একটানা সঞ্চরণের ফলেও এমন কোনো বস্তুর সঙ্গে এর সংঘাত হয় না যা একে পরিমিত মাত্রায় শোষণ করতে পারে। সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে-পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মি উৎপন্ন হয়েছে, তাদের সম্মিলিত বর্ষণ-ধারায় আজও সিক্ত হচ্ছে সমগ্র বিশ্বলোক। শুধু মহাকাশের দূরতম প্রদেশ থেকেই নয়, কাল পারাবারের গভীরতম প্রদেশ থেকেও বার্তাবহ মহা-আগন্তুকের মতো এই রশ্মির আবির্ভাব। এই গোপন বার্তারহস্য যথাযথ উদ্‌ঘাটিত হলে জানা যাবে যে বিশ্ব-ইতিহাসে কোথাও, কোনো এক কালমাত্রায় বিপুল পরিমাণে বস্তুপদার্থের প্রলয় ঘটেছে।

নক্ষত্রের স্থিতিকাল ও বাধাভেদকারী বিপুল শক্তিসম্পন্ন এই রশ্মির মিলিত সাক্ষ্যকে যদি, বস্তুধ্বংস বা বস্তুর বিকিরণে রূপান্তরের, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব'লে স্বীকার করে নিই, তাহলে এই রূপান্তরকে বিশ্ববিধানের মূল প্রক্রিয়া সমূহের অঙ্গীভূত ব'লে মেনে নিতে হয়। তথ্য হিসেবে জড়ের অবিনাশিতা বিজ্ঞান থেকে লোপ পায়, কিন্তু জড়মান ও তেজের অবিনাশিতার ভেদ যায় মিলিয়ে। দেখা যাচ্ছে তিনটি প্রধান অবিনাশিতা সূত্র, অর্থাৎ জড়, জড়মান ও তেজের অবিনাশিতা, কেবলমাত্র একটি সূত্রে গিয়ে মিলেছে। বহুরূপধারী একটিমাত্র মূল সত্তা, যা বিশেষ করে বস্তু ও বিকিরণের রূপ গ্রহণ করতে পারে, তা নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অমরত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করেছে; তারই সম্মিলিত মাত্রা সমগ্র বিশ্বকর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তার পূর্ণমাত্রা রয়েছে অক্ষুণ্ন। কিন্তু ক্রমাগত তার প্রকৃতির পরিবর্তন চলছে, আর এই প্রকৃতি-পরিবর্তনই আমাদের বিশ্বলীলাভূমিতে প্রধান ক্রিয়া ব'লে মনে হয়। আমার মনে হয় আয়ত্তাধীন সমস্ত তথ্য এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, তুচ্ছ ব্যতিক্রম বাদে, এই পরিবর্তনের স্রোত অনন্তকাল ধরে একই দিকে প্রবাহিত—কঠিন বস্তু অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে বস্তুধর্ম-হীন বিকিরণে, বাস্তবের রূপান্তর হচ্ছে অবাস্তবে।

এ-সব মতবাদের বিশদ আলোচনা করা হল, কারণ বিশ্বের মূল রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে এদের একটা বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখা গেছে কি করে তরঙ্গ-বলবিদ্যা সমগ্র বিশ্বকে তরঙ্গ-সমষ্টিতে রূপান্তরিত করেছে। ইলেকট্রন-প্রোটোন এক জাতীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে, বিকিরণ সৃষ্টি করে পৃথক জাতীয় তরঙ্গ। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা থেকে একথাই মনে হয় যে বস্তু ও বিকিরণ হয়তো দুটি পৃথক ও অপরিবর্তনীয় রূপধারী তরঙ্গ নয়। এদের পরস্পর রূপ-বিনিময় সম্ভব; একটি রূপান্তরিত হয় অন্যটিতে, যেমন 'শুককীটের রূপান্তর ঘটে

প্রজাপতিতে'। কোনো কোনো বিজ্ঞানী হয়তো এর সঙ্গে একথা যোগ করা দরকার মনে করবেন 'আবার যেমন প্রজাপতির রূপান্তর ঘটতে পারে শুককীটে'।

তা ব'লে একথা বলা চলে না যে বস্তু ও বিকিরণ একই পদার্থ। 'বস্তুর বিকিরণে রূপান্তর' একথার এখন পর্যন্ত কিছু অর্থ আছে, যদিও ছাব্বিশ বছর আগে সর্বপ্রথম যখন আমি এই মত প্রচার করি তখন একে যেরূপ বিপ্লবসূচনাকারী তথ্য ব'লে মনে করা হত, বর্তমানে তার চেয়ে ঢের কম ব'লে মনে করা হয়। যদিও জানি না, তথাপি সমস্ত তথ্য যদি নিশ্চিতরূপে জানা যেত, তাহলেও বিশেষজ্ঞদের ভাষা ছাড়া এই অবস্থার নিখুঁত ব্যাখ্যা কঠিন হত। কিন্তু বস্তু ও বিকিরণকে দুইটি পৃথক জাতীয় তরঙ্গ ব'লে ভাবলে প্রকৃত অবস্থার খুব কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব—এক জাতীয় তরঙ্গ চলে বৃত্তাকারে, দ্বিতীয়টি চলে সরল রেখা ধরে, আলোকের গতি নিয়ে; কিন্তু প্রথমটির গতি অপেক্ষাকৃত কম। মোশারাফা (Mosharrafa) ও অন্যান্য বিজ্ঞানী এরূপ কথাও বলেন যে এই মতবাদ বস্তু ও বিকিরণের সমস্ত পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারে—বস্তু এক ধরনের ঘনীভূত বিকিরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, বিকিরণের স্বাভাবিক গতির চেয়ে তার গতিমাত্রা কম। পূর্বেই বলা হয়েছে গতিশীল বস্তুকণার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কি ভাবে তার গতির উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরতা এমনি যে, কোনো বস্তুকণার গতি আলোর গতির সমান হলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হবে তার সমজড়মানের একটি ফোটোনের সমান। এই অভিনব তথ্য এই মত প্রতিষ্ঠা করতে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে যে, একদিন হয়তো প্রমাণ হবে বিকিরণ আলোকের গতি নিয়ে ধাবিত বস্তুকণা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর বস্তুকণা অপেক্ষাকৃত কম গতিতে সঞ্চরিত বিকিরণ। প্রমাণ করা দূরে থাক, আজ্ও এ-তথ্য থেকে বিজ্ঞান বহুদূরে রয়েছে।

পূর্ববর্তী ও বর্তমান অধ্যায়ের মূল তথ্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলে এই দাঁড়ায় যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ঝোঁক হল সমগ্র জড়-বিশ্বকে তরঙ্গে বিভক্ত করা। এই তরঙ্গ দুই জাতের—আবদ্ধ-তরঙ্গ (bottled up waves), যাদের বলি জড়বস্তু; আর মুক্ত-তরঙ্গ (unbottled waves), যাদের বলি বিকিরণ বা আলো। বস্তুধ্বংস-প্রক্রিয়া হল শুধু এই অবরুদ্ধ তরঙ্গ-তেজকে (wave-energy) বাঁধন-মুক্ত করে মহাশূন্যের পথে তার অবাধ গতি সঞ্চার করা। এই চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বকে রূপান্তরিত করেছে এক প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশিত বিকিরণ-বিশ্বে (World of Radiation)। পদার্থের মূল-উপকরণ যে তরঙ্গের বহুধর্ম প্রদর্শন করতে সমর্থ এ-তথ্য এখন আর আশ্চর্য ব'লে মনেই হয় না।

****

চতুর্থ অধ্যায়

আপেক্ষিকতা ও ঈথর

(RELATIVITY AND ETHER)

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান কি করে বিশ্বকে তরঙ্গে পরিণত করেছে পূর্বেই তার আলোচনা করেছি। বাস্তব কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে পরিচালিত না হলে যদি তরঙ্গের রূপ কল্পনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ধরে নেওয়া যাক যে এই তরঙ্গ 'ঈথর' (Ether) নামক এক বা একাধিক পদার্থের ভিতর দিয়ে চালিত হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে লর্ড সল্‌স্‌বারি (Lord Salisbury) এই 'ঈথরের' সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন 'স্পন্দিত হওয়া' (to undulate) ধাতুর কর্তা ব'লে। এই সংজ্ঞাকেই বর্তমানে যথেষ্ট ব'লে মনে করলে, ঈথরের মূল প্রকৃতির বিশদ আলোচনা না করেও তার অবতারণা করা যায়।

এই সংজ্ঞা থেকে, আধুনিক বিজ্ঞানের ঝোঁক কোন দিকে, তা খুব সংক্ষেপে বিবৃত করা চলে—এই বিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বকে এক বা একাধিক ঈথরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এ-সব ঈথরের প্রাকৃতধর্মের সূক্ষ্ম বিচার করা ভালো, কারণ এদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিশ্বের মূল প্রকৃতি।

পূর্বাহ্ণেই আমাদের সিদ্ধান্তের কথা ব'লে রাখা ভালো ; তা সংক্ষেপে হল এই যে, ঈথর ও তাদের স্পন্দন অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টিকারী তরঙ্গ সমূহ, খুব সম্ভবত কাল্পনিক। কিন্তু একথা বলা চলে না যে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদের অস্তিত্ব আমাদের মনে, তা না হলে তাদের আলোচনাই

চলত না। আমাদের মনে কোনো ধারণা জাগাতে হলে মনের বাইরে 'একটা কিছুর' অস্তিত্ব থাকবেই। এই 'একটা কিছুকেই' আপাতত নাম দেওয়া যেতে পারে 'বাস্তবতা' (reality); এই বাস্তবতার আলোচনা করাই আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পরে দেখা যাবে ঈথর, স্পন্দন ও তরঙ্গ বলতে পঞ্চাশ বছর আগে বিজ্ঞানী যা বুঝতেন, এই বাস্তবতা তার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক; এত পৃথক যে তাঁর মানদণ্ডে বিচার করলে ও তাঁর ভাষা প্রয়োগ করলে বলতে হয় যে ঈথর ও তাদের তরঙ্গ সম্পূর্ণ অবাস্তব। অথচ আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা দিয়ে যে-সব পদার্থের সঙ্গে পরিচয়, এরা তাদের মধ্যে সব চেয়ে বাস্তব; তাই যা-কিছু, যতটা বাস্তব ব'লে জানি, এদের বাস্তবতার দাবীও তার সমতুল্য।

ঈথরের ধারণা বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে প্রায় দুই শতাব্দী হল। স্থূল বস্তুর পরিচিত ধর্মগুলি কোনো ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হলেই, বিজ্ঞানীর দল একটা কাল্পনিক সর্বব্যাপী ঈথরের অবতারণা করে সেই দুরূহ সমস্যার সমাধান করতেন; এই ব্যাখ্যার জন্য যে-সব ধর্মের প্রয়োজন হতো তা তাঁরা আরোপ করতেন এই ঈথরের উপর। যে-সমস্যায়, শক্তির উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানে তার ক্রিয়ার কথা উঠত, সেখানেই তাঁরা এর প্রয়োগ করতে বিশেষ প্রলুব্ধ হতেন। একেই ভিত্তি করে খুব ভালো যুক্তি প্রয়োগ করা যায় যে, বস্তুর যেখানে অবস্থিতি শুধু সেখানেই তার ক্রিয়া সীমাবদ্ধ, এর বাইরে তার প্রভাব অনুভূত হতে পারে না। যে-কেউ এর প্রতিকূল যুক্তি প্রয়োগ করবে তার সমর্থনকারীর দলপুষ্টি সে আশা করতে পারে না। ডেকার্টে (Descartes) এমন কথাও বলেছেন যে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান রয়েছে, শুধু এই তথ্যই তাদের অন্তর্বর্তী স্থানে এক মাধ্যমের (Medium) অস্তিত্ব প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

লোহার উপর চুম্বকের ক্রিয়া বা নিম্নগামী বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ,

এই জাতীয় যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিচালনে যখন কোনো স্থূল বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন এক সর্বব্যাপী ঈথরের পরিকল্পনা প্রায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল; যাকে বলা যেতে পারে 'ঈথরীয় মেজজ,' (Ether-habit) তাই বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করল। ম্যাক্সওয়েল তাই বলেছেন, 'ঈথরের অবতারণা করা হয়েছে যাতে গ্রহদল তাতে ভেসে বেড়াতে পারে, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, দেহের একস্থান থেকে অন্যস্থানে বোধশক্তির পরিচলন ঘটতে পারে, অর্থাৎ যতক্ষণ না সমগ্র মহাশূন্য ঈথরে প্লাবিত হয়ে যায়।' অবশেষে দেখা গেল, পদার্থ-বিজ্ঞানে যতগুলি অমীমাংসিত সমস্যা রয়েছে ঈথরের সংখ্যাও প্রায় তাদের সমান।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় কেবলমাত্র একটি ঈথরই স্থান পেয়েছিল—তার নাম জ্যোতির্ময় ঈথর (Luminiferous Ether), বিকিরণ পরিচালনকারী ব'লে যাকে মনে করা হত। এই পরিচালনের কাজে যে-সব ধর্ম এর উপরে আরোপ করা দরকার হয়ে পড়েছিল তাদের সংজ্ঞা নিখুঁত ভাবে নির্দেশ করেছিলেন হাইগেন্স্ (Huyghens), টমাস ইয়ং (Thomas Young), ফ্যারাডে ও ম্যাক্সওয়েল। ঈথরকে মনে করা হত এক ঘন লালাজাতীয় পদার্থের সমুদ্র ব'লে; স্পন্দন বা আন্দোলন যেমন লালার ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়, ঠিক তেমনি এই ঈথরের মধ্য দিয়েও তরঙ্গের চলাচল ঘটতে পারে। এই তরঙ্গই হল বিকিরণ; এখন জানা গেছে এই বিকিরণ আলো, উত্তাপ, লাল বা বেগনি পারের রশ্মি (Infra-Red or Ultra-Violet Radiation), বৈদ্যুত-চৌম্বক তরঙ্গ (Electro-magnetic Waves), র‍্যণ্টগেন-রশ্মি (X-Rays), গাম-রশ্মি (γ-rays) ও মহা-জাগতিক রশ্মির যে-কোনো একটির রূপ গ্রহণ করতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনা, 'আলোকের অপেরণ' (Aberration of Light) ও অন্য অনেক ঘটনাবলী, এ-তথ্যই প্রমাণ করে যে, এরূপ কোনো ঈথরের যদি অস্তিত্ব থাকে তাহলে পৃথিবী ও যে-কোনো গতিশীল বস্তু কোনো আলোড়নের সৃষ্টি না করেই তার মধ্য দিয়ে চলবে। আবার, আমরা যদি পৃথিবীর উপর থেকে সমস্ত ঘটনাবলী অনুধাবন করি তাহলে দেখতে পাব যে এই ঈথর অবাধ গতিতে পৃথিবী বা অন্য যে কোনো বস্তুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়েছে। টমাস ইয়ং-এর প্রসিদ্ধ উপমার অবতারণা করলে বলতে হয়, 'সারি সারি গাছের ভিতর দিয়ে যেমন বায়ু প্রবাহিত হয়'। উপমাটা একেবারে ঠিক হল না, কারণ গাছের উপর হাওয়ার একটা প্রভাব আছে, পাতা ও ডালপালার আন্দোলন থেকে এই বায়ুপ্রবাহের প্রকোপের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু একথা প্রমাণ করা যায় যে, ঈথরের মধ্য দিয়ে গতির ফলে পৃথিবীস্থ নিশ্চল কঠিন বস্তুর এতটুকু আন্দোলনও ঘটবে না, বা এই বস্তু গতিশীল হলে তার গতি থাকবে সম্পূর্ণ অব্যাহত। মোটর গাড়ির বেগ বৃদ্ধি করতে হলে গতির বাধাসৃষ্টির আলোচনায় বায়ুর রোধশক্তির সঙ্গে ঈথরের রোধশক্তি যোগ না করাই ভালো।

কাজেই ঈথর ব'লে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেই ঈথর-প্রবাহের গতি ঘণ্টায় এক মাইল বা হাজার মাইল যাই হোক না কেন, তার কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না। এই তথ্য, প্রিন্সিপিয়ায় লিখিত নিউটনের একটি গতিবাদের সূত্র থেকে সমর্থিত হয়।

৫ম উপসিদ্ধান্ত (*Corollary V*)

'কোনো সীমাবদ্ধ স্থান গতিহীন হোক বা চক্রগতি ছাড়া, সরল পথে একটানা গতিতেই অগ্রসর হোক, তার অন্তর্ভূত-বস্তুসংঘের আপেক্ষিক গতি থাকে অব্যাহত।' নিউটন আরও বলেন—'এর পরিষ্কার প্রমাণ

পাই জাহাজের পরীক্ষা থেকে ; জাহাজ স্থির হয়েই থাক বা একটানা গতিতে সরল পথ ধরেই চলুক, জাহাজের উপরিস্থিত কোনো বস্তুর গতি তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না।'

এই সহজ সূত্র থেকে প্রমাণ হয় যে, জাহাজের উপরে সম্পাদিত ও জাহাজেই সীমাবদ্ধ, কোনো পরীক্ষা থেকেই শান্ত সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের গতির আভাসমাত্র পাওয়া যাবে না। আশা করি অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, শান্ত আবহাওয়ায় সমুদ্রের দিকে না তাকিয়ে বলা যায় না জাহাজ কোন দিকে চলেছে। গাছের ডালপালার আন্দোলন থেকে যেমন বায়ু প্রবাহের গতিবেগের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি পৃথিবীর বস্তু-পদার্থের উপর ঈথর-প্রবাহের কোনো প্রভাব থাকলে তার আঘাতে যে-আন্দোলনের সৃষ্টি হত তার থেকে আভাস পাওয়া যেত ঈথরের গতিবেগের। দেখা যাচ্ছে, অন্য কোনো পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া দরকার।

শুধু জাহাজেই সীমাবদ্ধ কোনো পরীক্ষা থেকেই সমুদ্রযাত্রী ঐ জাহাজের গতি নির্ণয় করতে পারে না, কিন্তু বাইরের সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সুযোগ পেলেই এই গতি সে সহজে স্থির করতে পারে। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপক সুতো-বাঁধা সীসের ওজনটি জলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তাকার ঢেউ উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু প্রত্যেক নাবিকেরই জানা আছে যে-বিন্দুতে এই সুতো জলে প্রবেশ করে তা এই বৃত্তাকার তরঙ্গের কেন্দ্রে থাকে না। জলের উপর বৃত্তের কেন্দ্র নির্দিষ্ট, কিন্তু যে-বিন্দুতে সুতো জলকে ছেদ করে তা জাহজের গতির সঙ্গে এগিয়ে চলে, তাই এই ছেদ-বিন্দু বৃত্তের কেন্দ্র থেকে যে-হারে (rate) অগ্রসর হবে তার থেকেই জাহজের গতি ধরা পড়বে।

পৃথিবী যদি কোনো ঈথর-সমুদ্রকে মথিত করে চলে তাহলে অনুরূপ

পরীক্ষা প্রয়োগে তার গতি ধরা পড়বার কথা। মিচেল্‌সন-মর্লির (Michelson-Morley) পরীক্ষা শুধু এই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনা করা
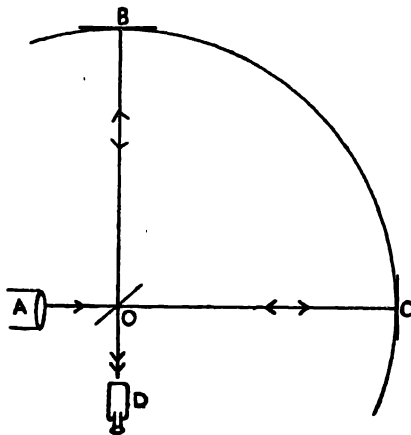
১ম চিত্র ॥ মিচেল্‌সন-মর্লি পরীক্ষার রেখাচিত্র

এক আলোকের উৎস A থেকে আলোক রশ্মি-প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এক-পৃষ্ঠ রৌপ্য সন্নিবিষ্ট (half-silvered) এক প্রতিফলক O-র-উপর, যাতে এই রশ্মির অর্ধেকাংশ OB রেখায় প্রতিফলিত হয়, বাকি অর্ধেক OC রেখা ধরে চলতে থাকে; OB ও OC রেখা দৈর্ঘ্যে সমান, এই দৈর্ঘ্যমাত্রা ১২ গজ। OB ও OC-তে স্থাপিত প্রতিফলক দুটি আপতিত রশ্মিকে প্রতিফলিত করে অবার O বিন্দুতে ফিরিয়ে আনে; এই রশ্মিদ্বয়ের অধিকাংশ তারপর একটি ছোট দুরবীন D-তে প্রবেশ করে; একটি রশ্মি অপরটি থেকে যতটা পিছিয়ে পড়ে তার মাত্রা তুলনা করা হয় যন্ত্রটিকে ৯০° ঘুরিয়ে দিলে তারা পরস্পর যতটা পিছিয়ে পড়বে তার সঙ্গে। OB ও OC-র দৈর্ঘ্যে সামান্য ভেদ থাকলে যে-ভুল হতে পারে এই প্রক্রিয়া তা দূরীভূত করবে॥

হয়েছিল। এই পরীক্ষায় পৃথিবী হল জাহাজ, আর ক্লেভল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (ওহিও) পরীক্ষাগার হল সেই-বিন্দু যে-বিন্দুতে গভীরতা পরিমাপক সীসের ওজন সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। সীসের টুকরো নিক্ষেপ করার সঙ্গে তুলনা করা হল এক আলোক-সংকেতের (Light-Signal) বিক্ষেপন; ধরে নেওয়া হল সংকেত সৃষ্টিকারী আলোক-তরঙ্গের আঘাতে ঈথর-সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি হবে।

আলোক-তরঙ্গের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আলোক-সংকেতকে প্রতিফলিত করে তার পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে প্রতিফলক দুটির যে-ব্যবস্থা করতে হয় তার থেকে যথেষ্ট খবর পাওয়া যায়। যাতায়াতে (double journey) আলোক-রশ্মির যতটা সময় লাগে এই পরীক্ষা থেকে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ঈথর-সমুদ্রে পৃথিবী যদি স্থির হয়ে থাকে তাহলে, আলোক-রশ্মি মহাশূন্যের পথে যে-কোনো দিকে চালিত হোক না কেন, নির্দিষ্টমাত্রার দৈর্ঘ্যে তার যাওয়া ও ফিরে আসার সময়ের মধ্যে কোনো ভেদ ঘটবে না। কিন্তু ঈথর-সমুদ্রে পৃথিবী যদি পূর্ব দিকে চলতে থাকে তাহলে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, পূর্ব-পশ্চিম ও পশ্চিম-পূর্ব পথে যাতায়াত কাল সমদৈর্ঘ্যমাত্রার উত্তর-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-উত্তর পথে যাতায়াত কালের চেয়ে একটু বেশি হবে। স্রোতের প্রতিকূলে ১০০ গজ ও স্রোতের অনুকূলে ১০০ গজ পথ নৌকা চালনায় যে-মোট সময় লাগে, স্রোতের আড়াআড়ি ২০০ গজ পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে তার চেয়ে কম। এই সাধারণ অভিজ্ঞতার মূলে যে-সূত্র, উপরোক্ত তথ্যের মূলেও এর চেয়ে জটিল সূত্র জড়িত নেই। প্রথম ক্ষেত্রে স্রোতের প্রতিকূল ও অনুকূল যাত্রায় নৌকার গতি হয় যথাক্রমে প্রতিহত ও বর্ধিত; কিন্তু প্রতিকূল স্রোতের বাধায় সময়ের যে-অপচয় ঘটে, স্রোতের আনুকূল্যে সময়ের সঞ্চয় তার সঙ্গে সমতা

রক্ষা করতে পারে না। দুজন দাঁড়ী, একই মুহূর্তে, এই দুই পথে সমগতিতে তাদের নৌকাযাত্রা আরম্ভ করলে যে-দাঁড়ী স্রোতের আড়াআড়ি যাবে সে যাত্রা শেষ করবে আগে; উভয়ের লক্ষ্যে পৌছবার সময়ের ব্যবধান থেকে স্রোতের বেগ সহজেই নির্ণয় করা যায়। আশা ছিল, ঠিক এ-ভাবেই, মিচেল্‌সন-মর্লির পরীক্ষায় দুটি আলোকরশ্মির এক নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করার সময়ের ভেদ থেকেই ঈথর-সমুদ্রে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করা যাবে।

বহুবার এই পরীক্ষা করা সত্ত্বেও সময়ের কোনো ভেদ দেখা গেল না। পৃথিবীকে ঘিরে আছে এক ঈথর-সমুদ্র, এই অনুমান করে পরীক্ষায় দেখা গেল ঈথর-সমুদ্রে পৃথিবীর গতিহীনতা। মনে হচ্ছে, ঈথর-সমুদ্রে পৃথিবী নিত্যকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সূর্য ও সমগ্র নক্ষত্রলোক তাকে প্রদক্ষিণ করছে; কোপরনিকসের (Copernicus) পূর্বে যে-ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের (Geocentric Universe) মতবাদ প্রচলিত ছিল, এই পরীক্ষা তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল ব'লে মনে হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাকে এই পরীক্ষার যথার্থ ব্যাখ্যা ব'লে স্বীকার করা অসম্ভব; কারণ এ-তথ্য নিশ্চিত প্রমাণ হয়েছে যে পৃথিবী সেকেণ্ডে প্রায় ২০ মাইল বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, আর এই পরীক্ষার সুগ্রাহিতা বা সূক্ষ্মতা এত বেশি যে এই বেগমাত্রার শতাংশের এক অংশও অনায়াসেই এতে ধরা পড়বে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফিৎস্‌জেরাল্‌ড্‌ (Fitzgerald) ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লরেন্‌ৎস্‌ (Lorentz) এই পরীক্ষার এক পৃথক ব্যাখ্যা করেন। পরীক্ষাকারী, দুটি আলোকরশ্মিকে একই সময়ে দুটি সমদৈর্ঘ্যমাত্রার পথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ না করে এরূপ কল্পনা করা যেতে পারে যে এই পথ দুটির দৈর্ঘ্য মাপা বা তুলনা করা হয়েছিল সাধারণ দৈর্ঘ্য পরিমাপকারী দণ্ডের (measuring rods)

সাহায্যে। ফিৎস্‌জেরাল্‌ড্‌ ও লরেন্‌ৎস্‌ এই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, "কী করে জানা গেল, এই দণ্ড বা তার সাহায্যে নির্ধারিত পথ, ঈথর-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অগ্রগতির ফলে, আপন নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে?" জাহাজ যখন সমুদ্রে চলতে থাকে তখন জলের চাপে তার দৈর্ঘ্যের হ্রাস ঘটে। চাপ দিয়ে সমুদ্র তার সম্মুখভাগকে পিছন দিকে ঠেলে, আর তার স্ক্রু (screw) তার পশ্চাৎভাগকে সামনের দিকে ঠেলে রাখে; এই দুই বিরুদ্ধ চাপে পিষ্ট হয়ে জাহাজের দৈর্ঘ্য যায় কমে। এই কমতির মাত্রা অতি সামান্য, এক ইঞ্চিরও অতি ক্ষুদ্র এক অংশ। ঠিক এ-ভাবেই হাওয়ার ভিতর দিয়ে ধাবমান মোটরগাড়ির দৈর্ঘ্য-সংকোচ ঘটে, গাড়ির সম্মুখস্থ বায়ুরোধকারী পর্দার উপর হাওয়ার চাপ ও পিছনের চাকার সম্মুখগতি এই দুই পরস্পর-বিরোধী চাপে গাড়ি সংকুচিত হয়। মিচেল্‌সন-মর্লির যন্ত্রও যদি এ-ভাবেই সংকুচিত হয় তাহলে ঈথর-প্রবাহের প্রতিকূল ও অনুকূল যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য, এই প্রবাহের আড়াআড়ি যাত্রাপথের দৈর্ঘ্যমাত্রার চেয়ে সব সময়েই কম হবে। এই দৈর্ঘ্য-সংকোচ, ঈথর-প্রবাহের প্রতিকূল ও অনুকূল যাত্রাপথের অন্যান্য অসুবিধা খানিকটা প্রশমিত করবে; এই অসুবিধা সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে ঠিক উপযুক্ত মাত্রার সংকোচনে, তখন আড়াআড়ি ও প্রতিকূল-অনুকূল পথে যাতায়াত সময়ের ভেদ যাবে সম্পূর্ণ ঘুচে। ফিৎস্‌জেরাল্‌ড্‌ ও লরেন্‌ৎস্‌ বললেন যে এ-ভাবেই মিচেল্‌সন-মর্লি পরীক্ষার 'পরিণাম-শূন্যতার' (Nil-Result) কারণ নির্দেশ করা যায়।

এই চিন্তাধারা একেবারে কাল্পনিক নয়, কারণ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লরেন্‌ৎস্‌ প্রমাণ করলেন যে ঠিক এই পরিমাণ সংকোচনই তৎকালীন বৈদ্যুত-বলবিদ্যা (Electro-dynamics) দাবী করে। এই সংকোচন, জাহাজ বা মোটরগাড়ির সংকোচনের অনুরূপ না হলেও, এদের সাহায্যে

সংকোচনের মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা জন্মায়। বস্তুতঃ, লরেন্ৎস্ প্রমাণ করলেন যে জড়পদার্থ শুধু যদি বৈদ্যুতকণার সমষ্টিই হয়ে থাকে, তাহলে, ঈথরের ভিতর দিয়ে গতির ফলে তার উপাদান-কণাগুলির স্থান পরিবর্তন ঘটবে ; যতক্ষণ এই পদার্থ এক নির্ধারিত মাত্রায় সংকুচিত না হবে, ততক্ষণ তার বৈদ্যুতকণাগুলি পূর্ব আপেক্ষিক-স্থিতি (relative rest) ফিরে পাবে না। মিচেল্সন-মর্লি পরীক্ষার 'পরিণাম-শূন্যতা' ব্যাখ্যা করতে হলে যে-সংকোচন মাত্রার প্রয়োজন, লরেন্ৎস্ নির্ধারিত এই সংকোচন মাত্রা একেবারে তার সমান।

কেন যে মিচেল্সন-মর্লি পরীক্ষা ব্যর্থ হল শুধু তারই পূর্ণব্যাখ্যা করে এই লরেন্ৎস্-সংকোচন ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু এই তথ্যও প্রমাণ হল যে পরিমাপকারী জড়-দণ্ড মাত্রই এমন নির্দিষ্ট পরিমাণে সংকুচিত হবে যাতে ঈথর-সমুদ্রে পৃথিবীর গতি চিরদিন প্রচ্ছন্ন হয়েই থাকবে। কাজেই একথা পূর্বাহ্নেই বলা যায় যে অনুরূপ সমস্ত পরীক্ষাই ব্যর্থ হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্য রকমের পরিমাপকারী দণ্ড রয়েছে—আলোকরশ্মি, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদির সাহায্যে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুর দূরত্বমাত্রা নির্ণয় করা যায়। অনুমান করা হয়েছিল যে-ক্ষেত্রে পরিমাপকারী 'জড়দণ্ডের' প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছে, 'আলোক ও বৈদ্যুতিক দণ্ড' সে ক্ষেত্রে হয়তো সফল হবে। লর্ড র‍্যালে (Lord Raleigh) ও ব্রেস (Brace) ও ট্রাউটনের (Trouton) মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নানারকমে বারবার পরীক্ষা করেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁরা বিফল হয়েছেন। ঈথরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতিবেগ যদি 'x' হয়, তাহলে মানুষের বুদ্ধিপ্রয়োগে উদ্ভাবিত যে-কোনো যন্ত্রই এর সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন গতিবেগ '—x' যোগ করে, 'x'-এর পরিমাপে গোল বাধায় ; মিচেল্সন-মর্লি পরীক্ষার আপাত ব্যর্থতারই পুনরাবর্তন ঘটে।

বহু বছরের কঠিন সাধনার পরিণাম দেখা গেল এই যে, ঈথরের মধ্যে পৃথিবীর গতিকে গোপন রাখতে প্রকৃতির শক্তিগুলি যেন এক সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ হল অনভিজ্ঞ লোকের ভাষা, বিজ্ঞানীর নয়; বিজ্ঞানী বলেন, ঈথরে পৃথিবীর গতি অনুসন্ধানের সমস্ত প্রচেষ্টাই প্রকৃতির নিয়মাবলী ব্যর্থ করে দেয়। দুটি উক্তিরই দার্শনিক ব্যাখ্যা একেবারে অভেদ। বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো নিরাশ হয়ে বলবেন যে, একযোগে ষড়যন্ত্র ক'রে প্রকৃতির শক্তিসমূহ তাঁর নিরন্তর গতিশীল যন্ত্র (perpetual motion machine) সৃষ্টির পথে 'অন্তরায়' হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানী জানেন যে এই 'অন্তরায়' ষড়যন্ত্রের চেয়েও অত্যধিক কঠিন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর—এ হল এক প্রাকৃতিক নিয়ম। আবার যে-সব অর্থবিদ্যার (Economics) নিয়মাবলী এক পাঁইটের (pint) পাত্র থেকে এক কোয়ার্ট (quart) বস্তু (২পাঁইট = ১কোয়ার্ট) সংগ্রহ অসম্ভব ব'লে প্রতিপন্ন করেছে, অতি উৎসাহী আনাড়ি সমাজ সংস্কারক ও অনভিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদ উভয়ই তাদের পশ্চাতে এক ঘোরতর ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করবেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইন্স্টাইন, প্রকৃতির এই কল্পিত নূতন নিয়মের প্রচার করেন—"প্রকৃতির এই বিধান যে, কোনো পরীক্ষাতেই 'পরম গতির' (absolute motion) নির্ধারণ অসম্ভব।" এই হল আপেক্ষিকবাদের মূলসূত্রের প্রথম সুসম্বদ্ধ রচনা।

আশ্চর্যের বিষয়, আইন্স্টাইনের এই মত নিউটনের মত ও চিন্তাধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। নিউটন তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে লিখে গেছেন: 'মনে হয় নক্ষত্রলোকের সুদুর প্রদেশে বা সম্ভবত তার দূরতম পরপারে কোথাও পরমগতিহীন এক বস্তু রয়েছে, কিন্তু পৃথিবী অধ্যুষিত প্রদেশে বস্তুসংঘের আপেক্ষিক সংস্থিতি থেকে এ-তথ্য জানা অসম্ভব যে, ঐ দূরবর্তী পরম-

নিশ্চল বস্তুর সঙ্গে এদের কেউ স্থিতিসমতা রক্ষা করে কিনা। অর্থাৎ আমাদের গ্রহলোকের বস্তু সংস্থিতি থেকে পরম গতিহীনতা নির্ণয় করা অসম্ভব।' এর সঙ্গে তিনি আরও একটু যোগ করেছেন: 'বস্তুর বিভিন্ন অংশে যে-সব রন্ধ্র রয়েছে তাদের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যদি কোনো মাধ্যম থেকে থাকে তার কথা এখানে বাদ দিলাম।'

অর্থাৎ নিউটনের এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে এক সর্বব্যাপী ঈথরের পরিকল্পনা ছাড়া মহাশূন্যের পথে পরম গতিবেগ (absolute speed of motion) নির্ধারণ করা অসম্ভব, আর এই মাধ্যমই এক অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্টমান (unmoving standard) যার তুলনায় সমস্ত বস্তুসংঘের গতি নির্ণয় করা সম্ভব।

মধ্যবর্তী দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞান এই কল্পিত মাধ্যমের প্রকৃতি আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল। এখন আইন্‌স্টাইন এক প্রবল অভিঘাতে তার প্রধান ধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটালেন—এই ধর্ম হল স্থিতির মানদণ্ড, যার তুলনায় যে-কোনো গতির আসল বেগ নির্ণয় করা যায়।

আইন্‌স্টাইনের সূত্র অন্য রকমেও ব্যাখ্যা করা যায়, এতে তার বৈশিষ্ট্য আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'নক্ষত্রলোকের সুদূর প্রদেশে বা সম্ভবত তার দূরতম পরপারে,' নিউটনের পরম গতিহীন বস্তু আজও জ্যোতির্বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি, তাই 'গতি' ও 'গতিহীনতা' এখনও শুধু সংজ্ঞা হয়ে রয়েছে। কোনো জাহাজ নিশ্চল, একথা শুধু আপেক্ষিক অর্থেই প্রয়োগ করা চলে, কারণ পৃথিবীর তুলনায় জাহাজ গতিহীন; পৃথিবী আবার সূর্যের তুলনায় গতিশীল, কাজেই জাহাজও সূর্যের তুলনায় গতিশীল। সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে পৃথিবী যদি স্থির হয়ে থাকত, তাহলে জাহাজও সূর্যের তুলনায় গতিহীন হত, কিন্তু উভয়ে তখনও চলতে থাকত নক্ষত্রলোকের মধ্য দিয়ে। নক্ষত্রের তুলনায় সূর্যের

গতি নির্ণয়ের পরেও বাকি থাকে দূরতম নীহারিকাসংঘের তুলনায় আমাদের ছায়াপথের অন্তর্গত নক্ষত্রমণ্ডলীর গতি। এই দূরবর্তী নীহারিকার দলও আবার সেকেণ্ডে শত শত মাইল বেগে পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে বা কাছাকাছি আসছে। মহাশূন্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করলে পরমগতিহীনতার কোনো মানদণ্ডের সন্ধান মেলে না, বরং ক্রমবর্ধমান গতিবেগের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পথনির্দেশক পদার্থ হিসেবে এক সর্বব্যাপী ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে পরমগতিহীনতার কী অর্থ তাই বলা যায় না, তার সন্ধান করা তো দূরের কথা। আইন্‌স্টাইনের সূত্র এখন এই নির্দেশ দিচ্ছে, প্রকৃতির দৃশ্যমান ঘটনাবলী সম্বন্ধে পরম-গতিহীনতার সংজ্ঞা আমরা যে-ভাবে খুশি দিতে পারি।

এ এক পরম বিস্ময়কর বার্তা। যে-ঘরে বসে আছি তা গতিহীন একথা বলার পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে, প্রকৃতি তাতে বাধা দেয় না। ঈথরের মধ্য দিয়ে পৃথিবী যদি সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে ছুটে চলে, তাহলে একথা ধরে নিতে হবে 'বনের মধ্যে ঝড়ের মতো' ঈথরও ঘরের ভিতর দিয়ে সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। আপেক্ষিকবাদ এই আশ্বাস দিচ্ছে যে ঈথর-প্রবাহের এই হাজার মাইল গতিবেগেও ঘরের ভিতরকার প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকবে; এর বেগ যদি সেকেণ্ডে লক্ষ মাইলও হয় বা কোনো ঈথর-প্রবাহ যদি নাই থাকে তাহলেও ঘটনাবলী থাকবে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ।

কল্পিত ঈথরের সঙ্গে যাদের কোনো যোগ নেই, এমন সব যান্ত্রিক ঘটনাও যে অক্ষুণ্ণ থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; নিউটনও একথা জানতেন। কিন্তু ঈথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে, তাহলে একথা খুবই আশ্চর্য ব'লে মনে হয়, যে-ঈথর আলো ও বিদ্যুতের বাহন তা গতিহীন হোক বা হাজার হাজার মাইল বেগে ছুটে

চলুক, আলোক-বিদ্যুতের ঘটনাবলী তাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না। একটা অনিবার্য প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয়—যে-ঈথরের গতিতে এই প্রবাহের সৃষ্টি তার কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা, অথবা এ শুধু কল্পনাপ্রসূত। কারণ একথা মনে রাখা দরকার যে ঈথরের অস্তিত্ব শুধু অনুমান সাপেক্ষ; বিজ্ঞানে এর অবতারণা করেছেন পদার্থবিজ্ঞানী, সব কিছুই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার অধীন একথা মেনে নিয়ে তাঁরা এই যুক্তি প্রয়োগ করেছেন যে আলোক-তরঙ্গ ও বৈদ্যুতচৌম্বক ঘটনাবলীর বাহন হবে এক যান্ত্রিক মাধ্যম (mechanical medium)।

এই অনুমানের মর্যাদা রক্ষা করতে তাঁদের প্রমাণ করতে হয়েছে যে মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাবলী পরিচালনায় ও দূরবর্তী প্রান্তে তাদের পৌঁছে দিতে, ঈথরের মধ্যে কতকগুলি চাপ, টান ও আবর্তের (push, pull and twist) অবতারণা করা যায়। ঘণ্টার তার যে-ভাবে ঘণ্টার আকর্ষণী থেকে ঘণ্টার মধ্যে যান্ত্রিক শক্তি পরিচালনা করে এও অনেকটা সেই রকমের। যথাসময়ে এই চাপ, টান ও আবর্তের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু এরা অত্যধিক জটিল ব'লে প্রতিপন্ন হল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, শুধু লক্ষিত ফল পরিচালনা করাই ঈথরের কাজ নয়, এই প্রক্রিয়ায় তাকে আবার আত্মগোপনও করতে হয়। পরীক্ষাকালে বিজ্ঞানী স্থির হয়েই থাক বা ঈথরের মধ্য দিয়ে সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগেই ছুটে চলুক, একটিমাত্র প্রক্রিয়া শুধু একধরনের ঘটনাবলী পরিচালনা করবে এরূপ ব্যবস্থা করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। বস্তুতঃ, উদ্ভাবিত এই প্রক্রিয়া এমন একটা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় যে দুই জাতীয় ঘটনাবলীর ভেদ ঘুচিয়ে দিতে বর্তমান ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রক্রিয়ার অবতারণা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

এই বাধার স্বরূপ নির্দেশ করতে হলে একটি সাধারণ ঘটনার বিস্তৃত

আলোচনা করতে হয়। ঈথরীয় পরিচালনের এই ব্যবস্থা অনুযায়ী, কোনো বস্তুতে বৈদ্যুত সঞ্চার করার ফলে তার পরিবেষ্টনকারী ঈথরে এক টানের সৃষ্টি হয়, অনেকটা ঠিক ঘনীভূত তরলপদার্থের সমুদ্রে কোনো পৃথকধর্মী বস্তুপদার্থ জোর করে প্রবেশ করাবার মতো। ঈথরে অবস্থিত দুটি গতিহীন বস্তুতে সহধর্মী বৈদ্যুত সঞ্চার করলে তারা পরস্পর বিকর্ষণ করে, আর এই টান ঈথরে যে-চাপের সৃষ্টি করে তা এই বিকর্ষণশক্তিকে পরিচালন করে ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে।

মনে করা যাক, বৈদ্যুতআশ্রিত বস্তু দুটি গতিহীন না হয়ে ঈথরের মধ্য দিয়ে সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। যেহেতু পরস্পরের তুলনায় এরা এখনও গতিহীন, আপেক্ষিকবাদ একথাই বলে যে এরা ঈথরে পরমগতিহীন হলে ঘটনাবলীর যে-ধারা হত, এ-ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হবে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ পৃথক প্রক্রিয়ায় এই ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়েছে; বিকর্ষণ এখনও আংশিক ভাবে ঈথরের কর্ষিত (strained) অবস্থারই পরিণাম; অবশিষ্ট অংশের মূলে চৌম্বকশক্তি, যাকে ঈথরের চাপ ও টান ব'লে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাকে আরোপ করতে হয় ঈথরে এক জটিল ঝঞ্ঝাবর্ত বা ঘূর্ণাবর্তের (cyclones or whirlwinds) উপর।

সাধারণত, অধিকতর জটিল বৈদ্যুতচৌম্বক ঘটনাবলীর উদ্ভব হয় বৈদ্যুত ও চৌম্বক শক্তির সমন্বয়ে, আর এই দুই জাতীয় প্রক্রিয়া পৃথক গতিবেগ নিয়ে, পৃথক অনুপাতে প্রবেশ করে ঈথরের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনাবলীর যান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা, একেবারে অভেদ ঘটনার সৃষ্টি করতে দুটি পৃথক প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা স্বীকার করছে। কোনো ঈথর এই উভয় প্রক্রিয়াকে স্থান দিতে পারে এ-তথ্য এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। যদিও বা প্রমাণ করা যায়, তাহলেও একটিমাত্র প্রত্যক্ষ ঘটনা সৃষ্টি

করতে যে-দ্বৈত প্রক্রিয়ার অবতারণা আবশ্যক, তা প্রকৃতির সাধারণ কর্মপদ্ধতির এতটা প্রতিকূল যে প্রতি পদে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ ভুল পথে চলেছি। গাছ থেকে ফল কেন নিচের দিকে পড়ে, এ-তথ্যের ব্যাখ্যা করতে নিউটনের মহাকর্ষ নিয়মকে যদি দ্বৈত-প্রক্রিয়ার (গ্রীষ্মকালে এক প্রক্রিয়া ও শরৎকালে অন্য প্রক্রিয়া) আশ্রয় নিতে হত তাহলে গ্রহণযোগ্য মতবাদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই তার ছিল না।

এ-ধরনের দ্বৈত-প্রক্রিয়াকে ত্যাগ করার আবশ্যকতার উপর নিউটন নিজেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে 'দর্শনশাস্ত্রে যুক্তিপ্রয়োগের নিয়ম' ব'লে কতকগুলি সূত্র রয়েছে। প্রথম দুটি সূত্র এখানে দেওয়া হল—

প্রথম সূত্র

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যথার্থ রূপ ব্যাখ্যা করতে যে-সব কারণ প্রকৃত ও যথেষ্ট ব'লে মনে হয় তাদের ছাড়া অন্য আর সব কারণ অস্বীকার করতে হবে।

এ-সম্বন্ধে দার্শনিকের দল বলেন যে প্রকৃতির ব্যবস্থায় কোনো কিছুই নিরর্থক নয়, যেখানে অল্পে কাজ চলে সেখানে বাহুল্যের প্রয়োগ বৃথা; কারণ প্রকৃতি অল্পেই তুষ্ট, বাহুল্যের আড়ম্বরকে সে বর্জন করে।

দ্বিতীয় সূত্র

কাজেই, যতদূর সম্ভব একই প্রাকৃতিক ক্রিয়ার উপর একই কারণ আরোপ করতে হবে।

যেমন মানুষ ও পশুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রস্তরের আবির্ভাব, রান্নার আগুনের ও সূর্যের আলো, পৃথিবী ও গ্রহলোকে আলোকের-প্রতিফলন।

বিকিরণ ও বৈদ্যুতিক ক্রিয়া পরিচালনে ঈথরকে মাধ্যমরূপে কল্পনা করার বিপক্ষে এক প্রবলতর যুক্তি আছে।

কি ভাবে বিদ্যুৎ, চুম্বক ও আলো সব যেন একযোগে ষড়যন্ত্র করে, ঈথরের মধ্য দিয়ে গতি নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করে, তা পূর্বেই বলা হয়েছে; কিন্তু বাকি রয়েছে মহাকর্ষ। পদার্থবিজ্ঞানে মহাকর্ষ সম্পূর্ণ পৃথক পর্যায়ের ঘটনা, তার প্রকৃতি একেবারে আলাদা। মহাকর্ষের সূত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে দূরত্বমাত্রা; দুটি বস্তুপদার্থের পরস্পর মহাকর্ষের টান নির্ভর করে তাদের দূরত্বমাত্রার উপর, দূরত্ব সমান হলে টানের মাত্রাও হবে সমান। দেখা যাচ্ছে, মত হিসেবে অন্তত, দূরত্ব নির্ণয়ে মহাকর্ষের নিয়ম এক পরিমাপকারী দণ্ডের ব্যবস্থা করেছে।

যে-ঈথর বৈদ্যুতিক ক্রিয়া পরিচালন করে তার পক্ষে মহাকর্ষের ক্রিয়া পরিচালন সম্ভব নয়, কারণ যে-সব ধর্ম তার উপর আরোপ করা হয় তাদের নিঃশেষে প্রয়োগ করতে হয় বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির পরিচালন কার্যের ব্যাখ্যায়। কাজেই মহাকর্ষের নিয়ম যে-পরিমাপকারী দণ্ডের ব্যবস্থা করেছে, আশা করা যায় তা হয়তো ফিৎস্‌জেরাল্‌ড্‌-লরেন্‌ৎস্‌ সংকোচনের (Fitzgerald-Lorentz Contraction) হাত এড়িয়ে যাবে, আর এই মানদণ্ডের সাহায্যে ঈথরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সম্ভাবনা পরীক্ষা করা যাক। ধরে নিচ্ছি পৃথিবী এক আদর্শ গোলকের প্রতীক; এরূপ পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রত্যেকটি বিন্দু তার কেন্দ্র থেকে সমদূরে অবস্থিত, তাই প্রত্যেকটি বিন্দুতেই পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি হবে সমান। এই আদর্শ গোলক যদি এখন ঈথর-সমুদ্রে, সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে ছুটে চলে, তাহলে ফিৎস্‌জেরাল্‌ড্‌-লরেন্‌ৎস্‌-সংকোচনের প্রভাবে তার ব্যাস গতির দিকে সংকুচিত হবে

৬০০ ফুট। পৃথিবীপৃষ্ঠের সমস্ত বিন্দুর তুলনায় এই সংকুচিত ব্যাসের প্রান্ত-বিন্দু দুটি তার কেন্দ্রের নিকটতর ব'লে পৃথিবীর বস্তুপদার্থ সব নেমে আসতে চাইবে এই দুটি বিন্দুতে।

এই নির্দিষ্ট সংকোচনের অস্তিত্ব থাকলেও তার মাত্রা হত এত কম যে বাস্তব পৃথিবীতে তার কোনো প্রভাবই দেখা যেত না; কারণ পাহাড় ও উপত্যকার বন্ধুরতা, আদর্শের দাবীতে যাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে, তারা এই ৬০০ ফুট সংকোচনকে সহজেই গোপন করে রাখতে পারে। কিন্তু মহাকর্ষের অনুরূপ ঘটনা আরো রয়েছে, বৃহৎমাত্রার দাবীতে যারা প্রকাশলোকের সীমানায় এসে ধরা দিয়েছে; এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল গ্রহের 'রবিনিম্নতার' (Perihelion) গতি। এই গতি থেকেই প্রমাণ করা হয়েছে যে, ঈথরের মধ্য দিয়ে বস্তুর গতিকে প্রচ্ছন্ন রাখতে মহাকর্ষ যেন অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। পরিমাপকারী জড়দণ্ড ফিৎস্‌জেরাল্‌ড্‌-লরেন্‌ৎস্‌-সংকোচন মেনে চললে, মহাকর্ষ প্রবর্তিত দৈর্ঘ্য পরিমাপকও তা মেনে চলবে। মহাকর্ষ ঈথরের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে পারে না ব'লে, তার পরিমাপকারী দণ্ড কী করে এই সংকোচনের অধীন হবে তা বোঝা কঠিন। এর একমাত্র সিদ্ধান্ত হল এই যে, ফিৎস্‌জেরাল্‌ড্‌-লরেন্‌ৎস্‌-সংকোচন মোটেই ঘটে না; কাজেই বাধ্য হয়ে, যান্ত্রিক ঈথরের অস্তিত্ব ত্যাগ করতে হয়।

আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করা ছাড়া উপায় নেই। প্রকৃতির সব কিছুই, বিশেষ করে আলোক-তরঙ্গ, যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এই প্রাথমিক অনুমানকে কেন্দ্র করেই যত বাধাবিঘ্নের উৎপত্তি; সংক্ষেপে, বিশ্বকে আমরা একটা বিরাট যন্ত্র ব'লে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছি। যেহেতু এই প্রচেষ্টা আমাদের ভুল পথে নিয়ে গেছে, তাই অন্য কোনো পথ-নির্দেশক সূত্রের সন্ধান করতে হবে।

যান্ত্রিক ব্যাখ্যার মায়াজালের চেয়ে অধিকতর নিরাপদ হল ওকাম্‌সের উইলিয়ম প্রবর্তিত সূত্র—"নিতান্ত বাধ্য না হলে কোনো সত্তারই অস্তিত্ব আমরা অনুমান করব না (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem)।" এর দার্শনিক ভূমিকা ও নিউটন প্রবর্তিত 'দার্শনিক যুক্তির' প্রথম সূত্রের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। উইলিয়মের সূত্র শুধু ধ্বংসকারী, এর প্রয়োগে কিছু-না-কিছু লোপ পায়, কিন্তু লুপ্ত অংশকে পুরণ করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমান ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বিশ্ব ও তার অন্তর্ভূত ঈথর, যাকে বাহন করে যান্ত্রিক ক্রিয়া 'মহাশূন্যের পথে' চালিত হয়, এই সূত্র তাদের কল্পনাকে দিয়েছে বাতিল করে, কিন্তু এর বদলে নূতন কিছু দিয়ে যায়নি।

এই ব্যবধানকে পুরণ করার নিশ্চিত উপায় হল আপেক্ষিকবাদের প্রবর্তন করা: "প্রকৃতির ব্যবস্থায় কোনো পরীক্ষার সাহায্যেই 'পরমগতি' নির্ধারণ সম্ভব নয়।" ঈথরকে পরিত্যাগ করায় যে-শূন্যের উদ্ভব হল, এই সূত্র দিয়ে তা পুরণ করা প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত ব'লে মনে হতে পারে; এই দুটি মতবাদ এত পৃথক প্রকৃতির যে একই পরিমাপের রন্ধ্র উভয়েই পুরণ করতে সক্ষম একথা অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হয়। বস্তুতঃ একটি অপরটির প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত; ঈথরের মূল ধর্ম ছিল তুলনার এক নির্দিষ্ট গণ্ডী নির্ধারণ করা, আমাদের প্রাথমিক অনুমানের সঙ্গে প্রকৃতির পরিকল্পনার (Scheme of Nature) সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টার ফলে পরিণতি লাভ করেছে তার অন্য সব ধর্ম। আপেক্ষিকবাদ, মূলত, এই প্রাথমিক অনুমানকে বাতিল করে দিতে চায়, তাই এই দুটি মতবাদ পরস্পর বিরোধী।

তাই এদের অন্তর্বর্তী সমস্যা অত্যন্ত পরিস্ফুট, পরীক্ষা এর মীমাংসা করতে সক্ষম। বিচারফলে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই; ঈথরের

অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সব পরীক্ষাই ব্যর্থ হয়েছে, এই ব্যর্থতাই আপেক্ষিক-বাদের ভিত্তিকে অধিকতর সুদৃঢ় করেছে। আজ পর্যন্ত যত পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিই আপেক্ষিকবাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছে।

যান্ত্রিক ঈথরের মতবাদ এ-ভাবেই আসনচ্যুত হল, আর তার স্থানে অধিষ্ঠিত হল আপেক্ষিকবাদ। বিপ্লবের সংকেত এল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে, আইন্‌স্টাইন কর্তৃক প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র রচনা থেকে। এর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অন্তর্ব্যবস্থার পর্যালোচনার গুরুভার এসে পৌঁছল এঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানীর হাত থেকে গণিতবেত্তার হাতে।

এর পূর্বে দেশমাত্রাকে মনে করা হত এমন একটা-কিছু যা আমাদের ঘিরে রয়েছে, আর কালমাত্রাকে (time) মনে করা হত এমন একটা-কিছু যা প্রবাহিত হচ্ছে আমাদের অতিক্রম করে বা ভেদ করে। সব রকমে, দেশ ও কালের যেন একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। দেশমাত্রায় পিছন দিকে ফিরে আসা যায়, কিন্তু কালমাত্রায় তা কখনোই সম্ভব নয়; দেশমাত্রায় আমাদের গতি ইচ্ছামতো বাড়াতে কমাতে পারি বা একেবারে গতিহীন হয়ে থাকতে পারি, কিন্তু কালপ্রবাহের গতি কেউ পরিবর্তন করতে পারে না—কালস্রোত বয়ে চলেছে এক অনিবার্য গতিতে। কিন্তু চার বছর পরে মিন্‌কৌস্‌কী (Minkowski) ব্যাখ্যা করেন যে আইন্‌স্টাইনের প্রথম ফল এই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেচে যে প্রকৃতি এ-সবের কিছুই জানে না।

আগেই বলা হয়েছে জড়পদার্থের মূল উপাদান হল বৈদ্যুত, তাই সমগ্র প্রাকৃতিক ঘটনাবলী চূড়ান্তভাবে বৈদ্যুতিক। মিন্‌কৌস্‌কী প্রমাণ করলেন, আপেক্ষিকবাদকে মেনে নিলে বলতে হবে যে সমস্ত বৈদ্যুতিক ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে এক অবিচ্ছিন্ন দেশ-কালমাত্রায়, দেশমাত্রা ও কালমাত্রায়

পৃথক ভাবে নয় (এতদিন পর্যন্ত যা মনে করা হত) ; দেশ ও কালের এই সংযোগ এত নিখুঁত যে মিলনস্থলের এতটুকু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, প্রকৃতির সমগ্র ঘটনাবলী এই নিগূঢ় যোগসূত্রকে দেশ ও কালে পৃথকরূপে বিভক্ত করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সম্মিলনে ক্ষেত্রফলের উৎপত্তি, যেমন একটি ক্রিকেট-মাঠ। খেলোয়াড়ের দল বিভিন্নরূপে একে দুইমাত্রায় (two dimensions) ভাগ করে নেয় ; বোলারের (Bowler) যেটা সম্মুখদিক (forwards), ব্যাটসম্যানের (Batsman) তা পশ্চাৎ দিক (backwards), আর আমপায়ারের (Umpire) তা হল বাঁ-থেকে-ডান দিক। কিন্তু দিক-বৈচিত্র্যের কোনো খবরই ক্রিকেট-বল রাখে না, আঘাত করে তাকে যেখানে পাঠানো হয় সে সেখানেই যায় ; প্রকৃতির নিয়মাবলীই তার গতি ও গন্তব্যস্থান নির্দেশ করে, এই নিয়মাবলীই মাঠের ক্ষেত্রফলকে এক অবিভাজ্য পূর্ণতা দান করেছে, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে সম্মিলিত করেছে একটিমাত্র অভেদ এককে (undifferentiated unit)।

আবার দুইমাত্রার ক্ষেত্রফলের (যেমন ক্রিকেট-মাঠ) সঙ্গে উচ্চতা (একমাত্রা) যোগ করলে তিনমাত্রার দেশ (space) সৃষ্টি হয় ; পৃথিবীর নিকটবর্তী স্থানে এরূপ ব্যবস্থা করলে মহাকর্ষের প্রভাবে এই 'দেশ' বিভক্ত হয়ে পড়ে উচ্চতা ও ক্ষেত্রফলে। যেমন, ক্রিকেট-বলকে নির্দিষ্ট দূরত্বমাত্রায় পৌঁছে দিতে যে-দিকে নিক্ষেপ করা সবচেয়ে কঠিন সেই হল উচ্চতার দিক। কিন্তু মহাশূন্যের পথে এরূপ পৃথককরণের কোনো ব্যবস্থাই প্রকৃতিতে নেই ; ক্ষিতিজ ও উর্ধ্বরেখার (horizontal and vertical) স্থানীয় ধারণা সম্বন্ধে প্রকৃতির নিয়মাবলী সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারা দেশমাত্রাকে মনে করে ত্রিমাত্রিক যার মধ্যে কোনো বিভাগ সম্ভব নয়।

সংযোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কল্পনায় আমরা একমাত্রা থেকে দুইমাত্রা ও
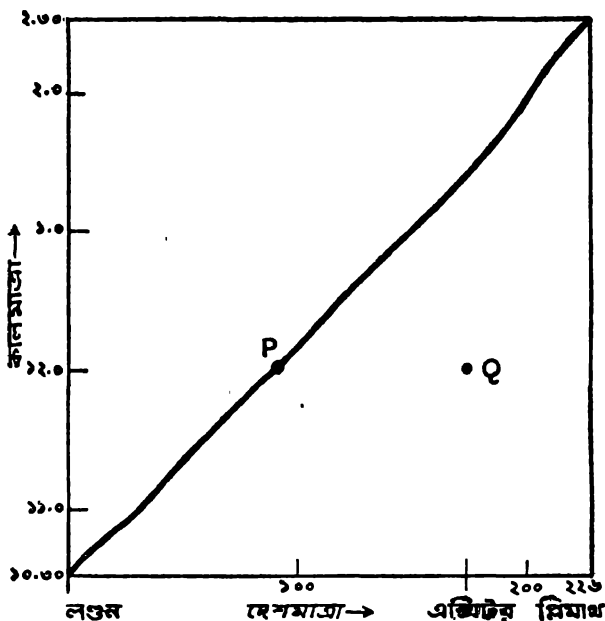
২য় চিত্র । 'দেশ' ও 'কাল' মাত্রায় ট্রেনের গতি নির্দেশ করার রেখাচিত্র

দুই থেকে তিনমাত্রায় পৌঁছেচি ; তিন থেকে চারমাত্রায় প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার, কারণ চতুর্মাত্রিক দেশ (four dimensional space) সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। যে-চতুর্মাত্রিক দেশ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করতে চাই তাকে কল্পনায় আনা অত্যধিক কঠিন, কারণ এর একটি মাত্রা সাধারণ দেশমাত্রায় আবদ্ধ নয়, সে হল কালমাত্রা। আপেক্ষিকবাদকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে কল্পনা করতে হবে এক চতুর্মাত্রিক 'দেশ', যার মধ্যে দেশের তিনমাত্রা অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ রয়েছে 'কালে'র একমাত্রার সঙ্গে।

একটি একটি করে আমাদের বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সাধারণ 'দেশের' একমাত্রা (যেমন দৈর্ঘ্য) ও কালের একমাত্রার সমন্বয়ে যে-দ্বিমাত্রিক দেশের উদ্ভব হয়, প্রথমত তার কথাই ধরা যাক। ২নং চিত্র হয়তো তা বুঝবার সহায়তা করবে। যে-কর্নিশ-রিভিয়েরা-এক্সপ্রেস (Cornish Riviera Express) গাড়ি সকাল সাড়ে-দশটায় প্যাডিংটন (Paddington) ছেড়ে ২২৬ মাইল দূরবর্তী প্লিমাথ (Plymouth) স্টেশনে বিকেল আড়াইটার সময় পৌছয়, এই রেখাচিত্র তারই সময়-তালিকার বিবরণ দিচ্ছে। ক্ষিতিজ-রেখা নির্দেশ করছে এই দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী ২২৬ মাইল রেলপথ, আর লম্বা-রেখা নির্দেশ করছে যে-কোনো একদিনের ট্রেনযাত্রার সাড়ে-দশটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত সময়ের মাত্রা।

স্থূল রেখাটি নির্দেশ করছে গাড়ির অগ্রগতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই রেখাস্থিত 'P' বিন্দু বেলা ১২টার ঠিক বিপরীত, আর প্যাডিংটন থেকে ৯১½ মাইল দূরবর্তী বিন্দুটির ঠিক উপরে অবস্থিত; অর্থাৎ এই গাড়ি বেলা ১২টার মধ্যে ৯১½ মাইল পথ অতিক্রম করেছে। আবার আর একটি বিন্দু 'Q' দুপুরে এক্সিটারের কাছাকাছি একটি স্থান নির্দেশ করছে। এই বিন্দুর অবস্থিতি স্থূল-রেখার উপরে নয়, কারণ দুপুরে গাড়ি এক্সিটরে পৌছয় না। চিত্রের সমগ্র ক্ষেত্রফল নির্দেশ করছে, বেলা সাড়ে-দশটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, প্যাডিংটন থেকে প্লিমাথের দূরত্ব রেখার উপর অবস্থিত সব স্থান। দেখা যাচ্ছে ২২৬ মাইল পথের দৈর্ঘ্য ও ৪ ঘণ্টা সময়কে একত্র যোগ করে পাওয়া গেল একটি ক্ষেত্রফল, যার একমাত্রা 'দেশ' ও একমাত্রা 'কাল'।

অনুরূপে এই কল্পনা করা যায় যে 'দেশের' তিনমাত্রা ও 'কালের' একমাত্রার সমন্বয়ে এক চতুর্মাত্রিক আয়তন (four dimensional

volume) গঠিত হবে; এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'নিখিল' (Continuum)। মিন্‌কৌস্‌কী আপেক্ষিকবাদের যে ব্যাখ্যা করেন তাতে এই দাঁড়ায় যে বৈদ্যুতচৌম্বক ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে এক চতুর্মাত্রিক নিখিলের মধ্যে ('দেশের' তিনমাত্রা ও 'কালের' একমাত্রা)। এই 'নিখিলে' 'দেশকে' 'কাল' থেকে পরমভাবে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব (it is impossible to separate the space from the time in an absolute manner)। অর্থাৎ এই 'নিখিল' এমন এক সত্তা যার মধ্যে 'দেশ' ও 'কালের' এমন পূর্ণসমন্বয়, এমন অপূর্ব মিলন ঘটেছে, যাতে প্রকৃতির নিয়মাবলী তাদের কোনো ভেদ বিচার করে না; যেমন ক্রিকেট-মাঠে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এমন নিখুঁত হয়ে মিশে যায় যে ধাবমান ক্রিকেট-বল তাদের কোনো পার্থক্য বিচার করে না, এই মাঠ তার কাছে শুধু একটি ক্ষেত্রফল যেখানে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ভেদ সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

এখন আপত্তি উঠতে পারে, ২নং চিত্র 'নিখিল'কে কল্পনা করার কোনো সাহায্যই করে না, এ-যেন শুধু রেখার সমষ্টি, প্রকৃত সময় ও দৈর্ঘ্যের সমন্বয় যথার্থ নির্দেশ করে না; নির্দেশ করে শুধু একটি দৈর্ঘ্যের সঙ্গে অপর একটি দৈর্ঘ্যের যোগ, যাতে পাওয়া যায় একটি ক্ষেত্রফল—বর্তমান ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা। এই আপত্তির কথা নিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই, কারণ পরে দেখতে পাব আমাদের চরম সিদ্ধান্ত হল এই যে চতুর্মাত্রিক 'নিখিল'ও (প্রায় একই অর্থে) রেখাচিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতির কর্মপদ্ধতিকে পরিস্ফুট করে তুলতে এই রেখাচিত্র শুধু একটি ভূমিকার কাজ করে, যেমন গাড়ির গতি নির্দেশ করতে ২নং চিত্র করেছে।

যেহেতু এই ভূমিকার মধ্যে সমগ্র প্রকৃতিকে দেখানো যায়, এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে কোনো বিষয়গত বাস্তবতার (objective reality) অনুরূপ

হবে। কিন্তু 'দেশ' ও 'কালে' প্রকৃতির বিভাগ বিষয়গত নয়, শুধু আত্মগত (subjective)। দুজনের মধ্যে যদি গতিভেদ থাকে তাহলে 'দেশ' ও 'কালের' অর্থ তাদের কাছে পৃথক হবে ; নানা রকমে আমরা নিখিলকে 'দেশ' ও 'কালে' ভাগ করে থাকি, যেমন বিভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে 'সম্মুখ' ও 'বাম' এই দুদিকের অর্থ দুজনের কাছে আলাদা হয়, অথবা 'বোলার' ও 'ব্যাটসম্যান' যেমন ক্রিকেট-মাঠকে নানা রকমে ভাগ করে, যার কোনো খোঁজই ক্রিকেট-বল রাখে না। এমন কি গাড়ির গতি রোধ করে বা চলন্ত 'বাস'-এ লাফিয়ে উঠে যখনই নিজের গতি পরিবর্তন করি, তখনই 'দেশ' ও 'কালে' নিখিলের বিভাগেরও পুনর্ব্যবস্থা করে থাকি। আপেক্ষিকবাদের মূলকথা হল এই যে, 'দেশ' ও 'কালে' নিখিলের এই বিভাগগুলি সম্বন্ধে প্রকৃতি কোনো খবরই রাখে না ; মিন্‌কৌস্‌কীর ভাষায় বলতে হয়—"দেশ ও কালের পৃথক সত্তা শুধু ছায়াতেই মিলিয়ে গেছে, কেবলমাত্র এদের সমন্বয় একটা বাস্তবতা রক্ষা করছে।"

এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, জ্যোতির্ময় ঈথর কেন বিশ্বছবি থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল—"সমগ্র মহাশূন্যে তার ব্যাপ্তি তাই নিখিলকে সে ভাগ করেছে 'দেশ' ও 'কালে'" এই ছিল ঈথরের দাবী। প্রকৃতির নিয়মাবলী এই বিভাগকে সম্ভব ব'লে স্বীকার না করায়, ঈথরের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকেও স্বীকার করতে পারে না।

আলোকতরঙ্গ ও বৈদ্যুতচৌম্বক শক্তিকে ঈথরে আন্দোলন ব'লে কল্পনা করে যদি তাদের পরিচালন প্রক্রিয়ার স্পষ্ট ধারণা করতে চাই, তাহলে এই ঈথরকে ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যারাডে প্রবর্তিত যান্ত্রিক ঈথর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা-কিছু ব'লে ভাবতে হবে। সমগ্র নিখিলে পরিব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র দেশ-কালকে অধিকার করে আছে, এরূপ এক চতুর্মাত্রিক রচনা

ব'লে একে মনে করা যেতে পারে ; অথবা ত্রিমাত্রিক ব'লে কল্পনা করলে এই ঈথর হবে ম্যাক্সওয়েল-ফ্যারাডে প্রবর্তিত ঈথর থেকে পৃথক এক আত্মগত সত্তা। তাহলে, আমরা প্রত্যেকেই আপন আপন ঈথর সঙ্গে নিয়ে চলব, যেমন বৃষ্টিধারায় প্রত্যেক দর্শকই নিজ নিজ রামধনু সঙ্গে নিয়ে চলে। গতিপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের জন্য এক নূতন ঈথরের সৃষ্টি করি, যেমন উজ্জ্বল বৃষ্টিধারায় কয়েক গজ এগিয়ে গেলেই এক নূতন রামধনুর সন্ধান পাই। পূর্বোক্ত বিস্ফারমান বিশ্ব (Expanding Universe) যদি নিছক ভ্রান্তি না হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেকের ঈথরই (Everyone's Ether) নিরন্তর বিস্ফারিত ও বিস্তৃত হতে থাকবে। এই জাতীয় রচনাকে ঈথর নাম দেওয়া যায় কিনা সেই হল সমস্যা ; উনবিংশ শতাব্দীর পুরানো ঈথরের সঙ্গে এর কোনো ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। বস্তুতঃ আপেক্ষিকবাদ, পুরানো ঈথরের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ব'লে, এই আপেক্ষিকবাদ সম্মত ঈথর হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই, একই নামে উভয়কে অভিহিত করার প্রচেষ্টা ভুল ব'লে মনে হয়।

এ-সম্বন্ধে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো যথার্থ মতভেদ আছে ব'লে মনে করি না। স্যর আর্থার এডিংটন (Sir Arthur Eddington) বলেন যে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের অর্ধেকসংখ্যা ঈথরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, বাকি অর্ধেক তাকে অস্বীকার করেন ; কিন্তু তিনি আরও বলেন, "উভয়দলেরই মূল কথা এক, কিন্তু পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে ভাষা প্রয়োগে।" ঈথরের বিষয়গত অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস করেন স্যর ওলিভার লজ (Sir Oliver Lodge) ; তিনি বলেন, "ঈথর, তার বিভিন্ন তেজের রূপে, বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, যদিও এর উনবিংশ শতাব্দীর অনুষঙ্গের (associations) জন্যে অনেকেই 'ঈথর' নামের

পরিবর্তে 'দেশ' শব্দ প্রয়োগ করতে চান। যে-কোনো সংজ্ঞাই প্রয়োগ করা হোক না, তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না।"

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—'ঈথর' বা 'দেশ', তার অস্তিত্ব বা অবর্তমানতা—যাই কেন বলা হোক না, তা যদি ধর্তব্যের মধ্যেই না আনা যায়, তাহলে ঈথরের অতি উৎসাহী ভক্তের দলও তার মধ্যে বিষয়গত বাস্তবতার সন্ধান পাবে না। আমার মতে, সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ঈথরকে ১৩৩ পৃষ্ঠার চিত্রের মতো একটি ভূমিকা ব'লে গ্রহণ করা: নিরক্ষবৃত্ত (Equator), উত্তর-মেরু বা গ্রীনিচের দেশান্তর রেখার (Meridian of Greenwich) অস্তিত্বের মতোই এর অস্তিত্ব বাস্তব বা অবাস্তব। চিন্তা বা মননশক্তি থেকেই এর উদ্ভব (creation of thought), জড়বস্তু থেকে নয়। তোমার বা আমার ঈথর থেকে পৃথক, 'যে-ঈথর' আমাদের সকলের কাছে অভিন্ন, তা কেমন করে সর্বকাল ও সর্বদেশকে অধিকার করে থাকে, কেমন করে তার দেশ ও কালমাত্রায় স্থিতির মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য ভেদ নির্ধারণ করা যায় না, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'কাল'কে অধিকার করে ঈথরের যে-ভূমিকা, যার সঙ্গে তার 'কালমাত্রার' (time-dimension) তুলনা করতে হবে, তা আমাদের আয়ত্তসীমায় রয়েছে—সে হল ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডে দিনের বিভাগ। এই বিভাগকে বাস্তব ব'লে না ভাবলে—যা কেউ কখনো ভাবে না বা ভাবেনি—ঈথরকেও বাস্তব ব'লে মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বিজ্ঞানের উপর আপেক্ষিকবাদ যে-নূতন আলোকসম্পাত করেছে তাতে দেখা যায় যে দেশমাত্রায় পরিব্যাপ্ত এক বাস্তব-ঈথরকে কালমাত্রায় পরিব্যাপ্ত এক বাস্তব-ঈথরের অনুগমন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—এদের মৈত্রী অটুট, বন্ধন অচ্ছেদ্য, মিলিত উত্থান বা মিলিত পতন।

দেখা যাচ্ছে, অনেকটা নিরাপদ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এখন ঈথরকে খাঁটি

অবাস্তব ব'লে ভাবতে পারি ; সব চেয়ে ভালো কল্পনা হল 'ঈথর একটি স্থানীয় বাসস্থান ও একটি সংজ্ঞা' (A local habitation and a name)। কিন্তু কার বাসস্থান ? বিশ্বের উপাদান তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়, আর 'স্পন্দিত হওয়া' ধাতুর কর্তা ব'লে প্রথমেই ঈথরের পরিচয় দেয়া হয়েছে। এই মত এখন ত্যাগ করতে হবে, কারণ বর্তমানে যে-চরম অবাস্তব ঈথরের আলোচনা করা হচ্ছে তা নিরক্ষবৃত্ত বা গ্রীনিচের দেশান্তর রেখার মতোই স্পন্দনে অক্ষম। এর থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে স্পন্দনশীল কোনো কিছুই এই অবাস্তব মাধ্যমের ভিতর দিয়ে পরিচালিত হতে পারবে না। তাপের ঢেউ বা আত্মহত্যার ঢেউ-এর (Suicide-wave) কথা আমরা ব'লে থাকি, কিন্তু এদের পরিচালনের জন্য কোনো স্পন্দনশীল মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তাপের ঢেউ হয়তো নিরক্ষবৃত্তকে প্রদক্ষিণ করে চলতে থাকে, আত্মহত্যার ঢেউ হয়তো চলে গ্রীনিচের দেশান্তর রেখা ধরে।

এরূপ মনে হতে পারে, যদিও ঈথরের অস্তিত্ব মীমাংসা করার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তবু নিউটন-বৃত্ত (Newton's Rings) অপবর্তন-বৃত্ত (Diffraction Patterns) ও ব্যতিকরণের ঘটনাবলী (Interference Phenomena), আলোকের তরঙ্গধর্ম প্রমাণ করতে যাদের সাধারণত উল্লেখ করা হয়, তাদের মূলে যে তরঙ্গধর্মী একটা কিছু ঈথরে পরিচালিত হচ্ছে তার সাক্ষ্য হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা পাওয়া যায় না, কারণ বস্তুকণার সাহায্যে এই কল্পিত তরঙ্গদলকে প্রকাশলোকের সীমায় আনা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে না। উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে ঈথরে পরিচালিত কোনো কিছুর সন্ধানই আমরা পাই না, যা পাই তা হল জড়বস্তুর উপর পদার্থের আঘাত। যতদূর জানা গেছে, গাণিতিক অবাস্তবতার

(mathematical abstraction) চেয়ে অধিকতর বাস্তব কোনো কিছু পরিচালিত হচ্ছে না—পৃথিবীর আবর্তনের ফলে তার উপরিতলে যেমন 'মধ্যাহ্ন' (noon) একস্থান থেকে অন্যস্থানে অগ্রসর হতে থাকে, এও অনেকটা সেই রকম। কিন্তু এই অবস্থায় হয়তো কোনো পদার্থ-বিজ্ঞানী বাধা দিয়ে বলতে পারেন—

পদার্থবিজ্ঞানী—যে-তেজের সৃষ্টি সূর্যে তার সন্ধান মেলে পৃথিবীর উপরে পতিত সূর্যের আলো থেকে ; আট মিনিট আগে এই তেজ ছিল সূর্যে, এখন এসেছে এখানে। তাই বলতে হবে, সূর্য ও পৃথিবীর অন্তর্বর্তী শূন্যপথ অতিক্রম করে এই তেজ সূর্য থেকে এখানে এসে পৌছেচে। মনে হয়, তেজ মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

গণিতবেত্তা—বর্তমান সমস্যাকে যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করে বলা যাক। সূর্যের আলোয় বসে এই বইখানা পড়ার সময় তার উপর এক সেকেণ্ডে যে-নির্দিষ্টমাত্রার আলো এসে পড়ে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। আপনার মতে আটমিনিট আগে এই আলো ছিল সূর্যে। তাহলে চারমিনিট আগে ছিল শূন্যপথে, সূর্য ও আমাদের মধ্যেকার দূরত্বমাত্রার অর্ধপথে। দু'মিনিট আগে ছিল আমাদের কাছ থেকে এই পথের এক-চতুর্থাংশ দূরত্বমাত্রায়, কি বলেন ?

পদার্থবিজ্ঞানী—হ্যাঁ, একেই আমি বলি মহাশূন্যে পরিচলন ; শূন্যপথের একস্থান থেকে অন্যস্থানে তেজ চলাচল করে।

গণিতবেত্তা—আপনার মতে তাহলে, কোনো এক মুহূর্তে মহাশূন্যের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে রয়েছে বিভিন্ন মাত্রার তেজ। যদি তাই হয় তাহলে কোনো এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে মহাশূন্যের এক নির্দিষ্ট অংশে কি পরিমাণ তেজ থাকবে তা হিসেব বা পরিমাপ করে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। যদি অনুমান করেন কোনো ঈথরের মধ্যে সূর্য স্থির হয়ে

আছে, আর সূর্যের আলো এই ঈথরে পরিচালিত তেজ, তাহলে স্বীকার করি এই প্রশ্নের একটা নির্দিষ্ট জবাব পেতে পারেন; ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল এর জবাব দিয়েছেন। আবার যদি মনে করেন সূর্য ও সৌরলোক, ঈথরের মধ্য দিয়ে সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে একটানা গতিতে ছুটে চলেছে, তাহলেও আপনার প্রশ্নের একটা নির্দিষ্ট জবাব পাবেন। কিন্তু দুটি জবাবের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, এই হল দুরূহ সমস্যা। বলতে পারেন কোনটি আসল জবাব ?

পদার্থবিজ্ঞানী—স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, প্রথমটি ঠিক—যদি সূর্য ঈথরের মধ্যে স্থির হয়ে থাকে ; আর দ্বিতীয়টি ঠিক—যদি সে সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে ঈথরের মধ্যে একটানা গতিতে ছুটে চলে।

গণিতবেত্তা—তা ঠিক, কিন্তু এ-বিষয়ে তো আমরা একমত যে, 'ঈথরের মধ্যে গতিহীনতা' ও 'ঈথরের মধ্য দিয়ে সেকেণ্ডে হাজার মাইল একটানা গতি' এই দুটি কথার কোনোটির কোনো মানেই হয় না। মানে করতে গেলেই প্রকৃতি তার ঘটনাবলীর নজির দেখিয়ে দাবী করে যে দুটি কথারই মানে হবে ঠিক এক। তাই বলতে হচ্ছে যে আপনার জবাব অর্থহীন।

অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করে দেখা যায়, মহাশূন্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিমাণ তেজ ভাগ করে দেবার চেষ্টা করলেই এমন একটা অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হয় যার কোনো সমাধান হতে পারে না। এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক যে এই প্রচেষ্টা আমাদের ভুল পথে চালিত করছে, আর মহাশূন্যের তেজের এই বিভাগ ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার, তেজের প্রবাহকে কোনো বাস্তব প্রবাহ ব'লে স্বীকার করার চেষ্টা বারবার হার মেনেছে। জলপ্রবাহ সম্বন্ধে একথা খাটে যে কোনো নির্দিষ্ট জলকণা সময়ের গতির সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে, কিন্তু তেজ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। শূন্যপথে তেজ প্রবাহিত হচ্ছে এই ধারণা

কল্পনাকে সহায়তা করে, কিন্তু তাকে বাস্তব ব'লে স্বীকার করতে গেলেই অসঙ্গতি ও পরস্পর-বিরোধিতা এসে হাজির হয়। অধ্যাপক পয়েণ্টিং (Poynting) এমন একটি প্রসিদ্ধ সূত্রের অবতারণা করেছেন, যার সাহায্যে কল্পনা করা যায় কেমন করে এক বিশেষ উপায়ে তেজ প্রবাহিত হচ্ছে ; কিন্তু তার অত্যধিক কৃত্রিমতা তার বাস্তবতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেমন, বৈদ্যুত-আশ্রিত কোনো সাধারণ চুম্বক স্থির হয়ে থাকলে এই সূত্রের সাহায্যে কল্পনা করা যায় যে, তেজ এই চুম্বককে অবিরাম গতিতে প্রদক্ষিণ করছে ; এ-যেন হাত ধরাধরি করে, অসংখ্য বৃত্তে, ছেলেমেয়েদের চিরন্তন উৎসব-নৃত্য। এই তেজের প্রবাহকে 'গাণিতিক তত্ত্ব' ব'লে মনে করে, গণিতবেত্তা এই সমস্যাকে বাস্তব সীমানায় ফিরিয়ে এনেছেন ; বস্তুতঃ তাঁকে প্রায় বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হয়েছে যে তেজ একটা গাণিতিক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়—ব্যাস-সমীকরণে (Differential Equation) সমাস-প্রক্রিয়ার (Integration) ধ্রুবরাশি (Constant)। একথা মেনে নিলে বলতে হয় যে, নিউইয়র্কের প্রমাণ-সময় (Standard time) ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্য এগিয়ে-দেওয়া সময় (Daylight saving time), বা মানমন্দিরের স্থানীয়কাল ও নাক্ষত্রকালের (Sidereal time) মতোই একই স্থানে দুটি পৃথক সময় থাকা যতটা অসঙ্গত, মহাশূন্যের কোনো প্রদেশে তেজমাত্রার দুটি বিভিন্ন মান থাকা তার চেয়ে খুব বেশি অসঙ্গত নয়। গণিতবেত্তা একথা স্বীকার না করলে তাঁকে এই অপাঙক্তেয় মতটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে যে, বস্তু ও বিকিরণ রূপধারী তেজ থেকেই বিশ্বের সৃষ্টি, আর তেজকে মহাশূন্যে নির্দিষ্ট করা যায় না। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব।

আপেক্ষিকবাদের অন্যান্য পরিণতি আলোচনা করার পূর্বে 'ঈথর' শব্দের

স্থানে 'নিখিল' শব্দ প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় ; এই 'নিখিল' হল চতুর্মাত্রিক 'দেশ,' যেখানে সাধারণ 'দেশের' তিনমাত্রার অভাব পুরণ করতে চতুর্থমাত্রারূপী 'কালের' অবতারণা করতে হয়েছে।

প্রকৃতির নিয়মাবলী তার ঘটনাবলীকে প্রকাশ করে দেশ ও কালমাত্রায়, তাই চতুর্মাত্রিক নিখিলের সঙ্গে যোগ রেখেই তাদের বর্ণনা করতে হবে। এই নিয়মাবলীর মাত্রাগত (quantitative) আলোচনায় জানা গেছে যে অতি বিশিষ্ট ও অতি কৃত্রিম উপায়ে দেশ-কালের পরিমাপ নির্ধারিত হয়েছে এরূপ কল্পনা করাই সুবিধাজনক। ফুট (foot) বা সেন্টিমিটরকে (centimetre) 'একক' ধরে আর দৈর্ঘ্যপরিমাপ করা চলবে না ; এখন 'একক' ধরতে হবে, আলো এক সেকেণ্ডে যে-পথ অতিক্রম করে, সেই ১৮৬,০০০ মাইলকে। আবার কালমাত্রা নির্ণয়ে সাধারণ 'সেকেণ্ডের' (ordinary second) প্রয়োগ চলবে না, তাকে —১ এই রাশিটির বর্গমূল ($\sqrt{-1}$, square root of—1) দিয়ে গুণ করে সেই রহস্যময় গুণফলকেই 'একক' ব'লে ধরে নিতে হবে। গণিতবেত্তা, $\sqrt{}$—১ একে এক কাল্পনিক সংখ্যা ব'লে নির্দেশ করেন, কারণ কল্পনার বাইরে এর কোনো অস্তিত্ব নেই ; দেখা যাচ্ছে অত্যধিক কৃত্রিম উপায়ে আমরা কালমাত্রার পরিমাপ করছি। যদি এ-প্রশ্ন ওঠে—পরিমাপের এই অস্বাভাবিক পদ্ধতি কেন প্রয়োগ করা হল, তাহলে বলতে হবে যে এই পদ্ধতি প্রকৃতির নিজেরই পরিমাপ-পদ্ধতি ব'লে মনে হয় ; অন্তত এদের প্রয়োগে আপেক্ষিকবাদের পরিণাম সব চেয়ে সহজ ভাবে প্রকাশ করা যায়। এর পরেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন এমন হল, তাহলে তার আর কোনো জবাব নেই ; জবাব দিতে হ'লে প্রকৃতির অন্তরে আছে যে-রহস্যলোক তার গহনে প্রবেশ করতে হবে।

এখন তাহলে এই অস্বাভাবিক পরিমাপ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে 'নিখিল-

রচনা'র কাজ আরম্ভ করা যাক। মিনকৌস্‌কী প্রমাণ করেছেন যে আপেক্ষিকবাদ নির্ভুল হলে, পূর্বোক্ত উপায়ে রচিত নিখিলে, প্রকৃতির নিয়মাবলী 'দেশ' ও 'কালের' কোনো ভেদ নির্দেশ করবে না। প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক নিয়মের ধারাবাহিক বর্ণনায় 'দেশের' তিনমাত্রা ও 'কালের' একমাত্রা একেবারে সমান অংশ গ্রহণ করে। এর ব্যতিক্রম হলেই, এই নিয়মের সঙ্গে আপেক্ষিকবাদের সামঞ্জস্য থাকবে না।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, নিউটন প্রবর্তিত মহাকর্ষের নিয়ম এই সর্ত মেনে চলে না ; কাজেই বলতে হবে, নিউটনের নিয়ম বা আপেক্ষিকবাদ এদের মধ্যে একটি ভুল। কি পরিবর্তন সাধন করলে এই নিয়ম আপেক্ষিকবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে, আইনস্টাইন তার বিচার করেন ; বিচারে দেখা গেল যে এই পরিবর্তনের ফলে আবির্ভাব ঘটে তিনটি নূতন ঘটনার, নিউটনের পুরানো নিয়মে যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, আইনস্টাইন ও নিউটনের নিয়মাবলীর মধ্যে কোনগুলি গ্রহণযোগ্য তার প্রত্যক্ষ বিচারের জন্যে প্রকৃতি তিনটি নির্দিষ্ট ধারার ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিচারের ফল হল আইনস্টাইনের অনুকূলে।

যাকে বলি 'মহাকর্ষের নিয়ম,' আসলে তা একটি গাণিতিক সূত্র ছাড়া আর কিছুই নয় ; এই সূত্র গতিশীল বস্তুপদার্থের 'গতিবৃদ্ধির হার' (acceleration) নির্ণয় করে। এই নিয়মের এক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে—দূরত্বের বিপরীত বর্গের অনুপাতিক (proportional to the inverse square of the distance) কোনো শক্তির প্রভাবে যে-কোনো জড়বস্তু তার সরল-রেখগতি থেকে (rectilinear motion) বিচ্যুত হলে যে-ভাবে চলতে থাকবে, মহাকর্ষের জালে আবদ্ধ হলেও তার গতি হবে ঠিক সেই রকম। তাই নিউটন এরূপ শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে তার নাম দিয়েছিলেন 'পৃথিবীর টান' (force of gravity)। শক্তির অবতারণা

করে, আইন্‌স্টাইনের নিয়মের এরূপ কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব হয়নি, বস্তুতঃ এর কোনো যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই হয়নি—যান্ত্রিক বিজ্ঞানযুগের অবসান ঘোষণা করার অনুকূলে আরও একটি প্রমাণ সংগ্রহ হল। কিন্তু জ্যামিতির ভাষায় এর এক সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব। আকর্ষণশীল বস্তুর জড়মানের প্রভাব, নিউটন প্রবর্তিত শক্তির সৃষ্টি না করে, এই বস্তুর নিকটবর্তী 'নিখিলকে' বিকৃত করে। গতিশীল গ্রহ বা ক্রিকেট-বল কোনো শক্তির প্রভাবে তাদের সরল-রেখ-গতি থেকে বিচ্যুত হয় না, নিখিলের বাঁকানো-গুণই তাদের বিচলিত করে। মহাকর্ষ একটা শক্তিই নয়; বস্তুমাত্র যে-নিখিলে থাকে তার একটা বাঁকানো-গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এমন কি আলোককেও এই বাঁকা-নিখিলের ধারা মানতে হয়।

বোঝার পক্ষে টানের ছবিটা ছিল সহজ; কিন্তু অবিকৃত চতুর্মাত্রিক নিখিলের ধারণা করাই যথেষ্ট কঠিন, তার উপর আবার তার বিকৃত কল্পনা করা, সে তো আরও দুরূহ ব্যাপার। দুই মাত্রার ক্ষেত্রফলের উপমাটি হয়তো এ-বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারে। ক্রিকেট-মাঠ বা আমাদের হাতের চামড়া দুইমাত্রার দেশ; আকর্ষণশীল বস্তুর প্রভাবে নিখিলে যে-বিকৃতির উদ্ভব হয় এ-ক্ষেত্রে উইঢিবি বা ফোস্‌কা তার সঙ্গে তুলনা করা হল। ধূমকেতু বা আলোকরশ্মি সূর্যের কাছাকাছি এলে যেমন তাদের ঋজু-রেখ-গতি থেকে বিচ্যুত হয়, ক্রিকেট-বলও উইঢিবির উপর দিয়ে গড়িয়ে যাবার সময় তার গতিপথ থেকে তেমনি বিক্ষিপ্ত হয়।

বিশ্বের সমগ্র বস্তুসম্বল চতুর্মাত্রিক নিখিলে যে-সম্মিলিত বিকৃতির সৃষ্টি করে, তারই প্রভাবে নিখিল বাঁকা হতে হতে অবশেষে এক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাই মহাশূন্য হয়েছে 'সসীম' (finite); এর ফলাফল দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'দেশ' ও 'কালের' পৃথক সত্তা আগেই বিশ্বছবি থেকে বিদায় নিয়েছে;

মহাকর্ষের শক্তিও এখন মিলিয়ে গেল, বাকি রইল শুধু এক বাঁকা-নিখিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিশ্বকে শুধু দুই জাতীয় শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করেছিল—এক হল মহাকর্ষের শক্তি, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করে ; আমাদের দেহ ও জড়বস্তুকে টানের জোরে পৃথিবীপৃষ্ঠে সংলগ্ন রাখে। আর দ্বিতীয় হল বৈদ্যুতচৌম্বক শক্তি, যা আলোক, তাপ, শব্দ, সংসক্তি, স্থিতিস্থাপকতা, রাসায়নিক পরিবর্তন জাতীয় অবশিষ্ট প্রাকৃত ঘটনাবলীকে নিয়মিত করে। এখন বিজ্ঞান থেকে মহাকর্ষের শক্তির যখন তিরোধান ঘটল, তখন এরূপ প্রশ্ন করা স্বাভাবিক—বৈদ্যুতচৌম্বকশক্তি কেন টিকে আছে, আর কি করেই বা নিখিলে তার আবির্ভাব হল ? এই প্রশ্নের চরম মীমাংসা না হলেও, একথা মনে হয় যে এই শক্তিও মহাকর্ষের পন্থাই অনুসরণ করবে। ভায়েল (Weyl) ও এডিংটন (Eddington) পর পর এরূপ মতবাদ প্রচার করলেন, যাদের মধ্যে বৈদ্যুতচৌম্বক শক্তির কোনো স্থান নেই ; সমগ্র প্রাকৃত ঘটনাবলীকে, নিখিলের এক বিশেষ ধরনের জ্যামিতির পরিণাম ব'লে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা তাঁরা করেছেন। উভয় মতবাদ সম্বন্ধেই আপত্তি উঠেছে। আইন্-স্টাইন প্রবর্তিত, ঠিক এই ধরনের একটি আধুনিক মতবাদের এখনও ভাগ্যপরীক্ষা চলছে। কিন্তু যে-কোনো মতবাদই শেষ পর্যন্ত টিকে থাক না কেন, একথা প্রায় নিশ্চিত ব'লেই মনে হচ্ছে যে অচিরেই কোনো না কোনো উপায়ে এই বৈদ্যুতচৌম্বক শক্তির দল বিভক্ত হয়ে পড়বে নিখিলের এক নূতন ধরনের বিকৃতিতে। নিখিলের যে-বিকৃতির ফলকে মহাকর্ষ নাম দেওয়া হয়েছে তার জ্যামিতি এই নূতন জ্যামিতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যদি তাই হয় তাহলে এই বিশ্ব এক চতুর্মাত্রিক শূন্য 'দেশে' পরিণত হবে ; ছোট, বড়, তীক্ষ্ণ ও ক্ষীণ কতগুলি বিকৃতি বাদে 'দেশ' হবে সম্পূর্ণ বস্তুহীন ও বৈচিত্র্যহীন।

যাকে এ-পর্যন্ত তেজের পরিচলন ব'লে এসেছি (যেমন, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলোকের আগমন) এখন দেখা যাচ্ছে সে, পৃথিবীস্থ কালমাত্রার আট মিনিট ও দৈর্ঘ্যমাত্রার ন'কোটি পঁচিশ লক্ষ মাইল বিস্তৃত নিখিলের এক রেখায়, ঢেউ-খেলানো বিকৃতির একটা অক্ষুণ্ণ ধারা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাস্তবতার দাবীতে নিখিলকে 'দেশ' ও 'কালে' বিভক্ত না করা পর্যন্ত এই অনবচ্ছিন্ন ধারাকে বাস্তব কোনো কিছুর পরিচলন ব'লে ধারণা করতে পারি না। কিন্তু নিখিলের এই ব্যবচ্ছেদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যে-নূতন বিশ্বছবি আপেক্ষিকবাদ আমাদের কাছে তুলে ধরেছে তার সহজ ও পরিচিত প্রতীক হল একটি সাবানের বুদবুদ, পৃষ্ঠ যার অসম ও ঢেউ-খেলানো। বিশ্ব হল এই বুদবুদের উপরিতল, অন্তর্প্রদেশ নয়। মনে রাখতে হবে, যদিও এর উপরিতল দুই মাত্রায় সীমাবদ্ধ, বিশ্ব-বুদবুদ (Universe-bubble) হল চতুর্মাত্রিক—'দেশের' তিনমাত্রা ও 'কালের' একমাত্রার সমন্বয়। যে-পদার্থ থেকে এই বিশ্ব-বুদবুদের উৎপত্তি সে হল শূন্য-কালের (empty time) সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধা শূন্য-দেশ (empty space)।

****

পঞ্চম অধ্যায়

অতল বিশ্বসমুদ্রে

(INTO THE DEEP WATERS)

শূন্যতা থেকে উদ্ভূত যে-বুদবুদ, আধুনিক বিজ্ঞান যার সাহায্যে বিশ্বছবির কল্পনা করেছে, তার কথা আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাক। পৃষ্ঠদেশ তার সমতল নয়, উঁচু-নিচু, ঢেউ-খেলানো। দুই জাতীয় বন্ধুরতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিকিরণ ও বস্তু ব'লে; এরাই বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান ব'লে মনে হয়।

প্রথম জাতীয় বন্ধুরতা হল বিকিরণ। সব বিকিরণই চলে একটানা গতিতে, সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। ২নং চিত্রে (১৩৩ পৃষ্ঠা) রেলগাড়ির গতিবেগ যদি মিনিটে এক মাইল হত তাহলে তার গতি নির্দিষ্ট হত, লম্ব-রেখার সঙ্গে ৪৫° কোণে নত, একটি নিখুঁত সরল রেখা দিয়ে। মিনিটে একমাইল গতিবেগ সম্পন্ন, পর পর সজ্জিত, বহুসংখ্যক গাড়ির গতি নির্দিষ্ট হত এই সরল রেখারই সমান্তরাল অনেকগুলি সরল রেখা দিয়ে। মিনিটে এক মাইল, এই নির্দিষ্ট গতিবেগকে সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিবেগে পরিবর্তিত করা যাক; আর লণ্ডন থেকে প্লিমাথ, এই একটি মাত্র দিকের বদলে, ধরা যাক মহাশূন্যের সর্বদিক। চতুর্মাত্রিক নিখিল এখন ১৩৩ পৃষ্ঠার চিত্রের স্থান গ্রহণ করবে; আর বিকিরণ নির্দিষ্ট হবে, কাল প্রবাহের দিক্‌রেখার সঙ্গে ৪৫° ডিগ্রিতে নত একদল সরল রেখা দিয়ে।

দ্বিতীয় ধরনের বন্ধুরতা হল জড়বস্তুর নির্দেশক। বিভিন্ন গতিবেগ নিয়ে

জড়বস্তু চলে মহাশূন্যের পথে, কিন্তু আলোর গতির তুলনায় তার গতিমাত্রা অনেক কম। মোটামুটি বিচার করলে, সব জড়বস্তুকেই 'দেশমাত্রায়' গতিহীন ও শুধু 'কালমাত্রায়' অগ্রসরমান ব'লে ধরা যেতে পারে; তাই যে-বন্ধুরতা দিয়ে এই বস্তু নির্দিষ্ট তা প্রসারিত হবে 'কালের' অগ্রগতির দিকে। যেমন, ২নং চিত্রে (১৩৩ পৃষ্ঠা) যে-ট্রেনের গতি দেখানো হয়েছে, তা কোনো স্টেশনে এসে থামলে, তার স্থিতিকাল নির্দিষ্ট হবে একটি ছোট লম্ব-রেখা দিয়ে।

যে-সব বন্ধুরতা জড়বস্তুর পরিচায়ক তারা এই বুদবুদের উপরিতলে প্রশস্ত রেখার সৃষ্টি করতে চাইবে, অনেকটা ক্যান্‌ভাসের পর্দার উপর রঙের প্রশস্ত প্রলেপের মতো। এর কারণ এই যে বিশ্বের বস্তুসম্বল, নক্ষত্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের মতো বৃহদায়তন বস্তুতে সন্নিবদ্ধ হতে চায়। এই চওড়া রেখাগুলির নাম 'বিশ্ব-রেখা' (world-lines)। সূর্যের 'বিশ্ব-রেখা,' প্রতি মুহূর্তে দেশমাত্রায় তার স্থিতি নির্দেশ করে। ৩নং চিত্র থেকে তা কল্পনা করা যায়।

'কেবল্' (cable) যেমন বহুসংখ্যক সরু 'তারের' সমষ্টি, তেমনি সূর্যের মতো বৃহৎ বস্তুর বিশ্ব-রেখাও তার উপাদান বস্তুর (পৃথক পরমাণুদলের) অসংখ্য সূক্ষ্মতর বিশ্ব-রেখা দিয়ে গঠিত। কোনো পরমাণুকে সূর্য যখন আত্মসাৎ বা মুক্ত করে দেয়, তখন তার সূক্ষ্ম বিশ্ব-রেখা মূল বিশ্ব-রেখায় এসে প্রবেশ করে বা তার থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

এই বুদবুদের উপরিতলকে কার্পেটের সঙ্গে তুলনা করলে, কার্পেটের সুতোগুলিকে পরমাণুসংঘের বিশ্ব-রেখা ব'লে মনে করতে পারি। পরমাণুকে নিত্য ও অবিনশ্বর ব'লে ভাবলে তার সূত্ররূপী বিশ্ব-রেখাগুলি, কালের অগ্রগতির দিকে, চিত্রের সমগ্র দৈর্ঘ্যমাত্রা অধিকার করে থাকবে। কিন্তু পরমাণুর প্রলয়ে এই সূত্রগুলির অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে,
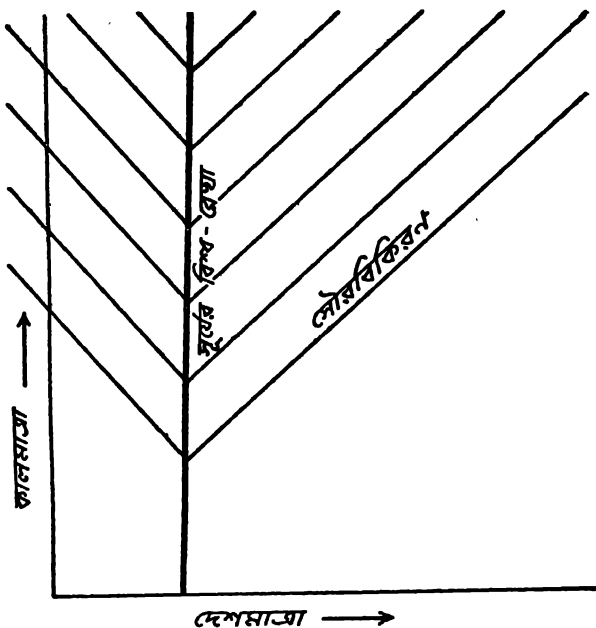
৩নং চিত্র ॥ 'দেশ' ও 'কাল' মাত্রায় সূর্যের গতি ও তার বিকিরণ নির্দেশ করার রেখাচিত্র। (১৩৩ পৃষ্ঠার ২নং ছবি দ্রষ্টব্য)

আর তাদের এই ছিন্ন প্রান্ত থেকে বিকিরণের বিশ্ব-রেখা-গুচ্ছ (tassels of world-lines) বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। 'কালের' দিক ধরে এই কার্পেটের উপর চলতে থাকলে, তার সূত্রগুলি 'দেশমাত্রায়' ক্রমাগত তাদের আপেক্ষিক স্থান বদল করতে থাকবে। তাঁতের ব্যবস্থা এমনি, যে এই সূত্র কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে স্থান বদল করতে বাধ্য ; এই নিয়মাবলীকেই আমরা বলি 'প্রকৃতির নিয়ম'।

পৃথিবীর বিশ্ব-রেখা যেন একটি ক্ষুদ্রতর 'কেবল্', কতকগুলি পৃথক পাকানো 'তার' দিয়ে তৈরি ; এরাই নির্দেশ করছে, পাহাড়, গাছ, এরোপ্লেন, মানুষ ইত্যাদি, যাদের সমষ্টিতে গড়ে উঠেছে এই পৃথিবী। প্রত্যেকটি পাকানো 'তার'ই আবার অনেকগুলি পৃথক 'তারের' সমন্বয়—তার পরমাণুদলের বিশ্ব-রেখা। যে-'তার' জীবদেহ নির্দেশ করছে তার সঙ্গে অন্য 'তারের' মূলগত বিশেষ পার্থক্য নেই ; প্রভেদ শুধু এই যে জীবদেহের গতি-স্বাচ্ছন্দ্য এরোপ্লেনের তুলনায় কম, কিন্তু গাছের তুলনায় বেশি। গাছেরই মতো, ক্ষুদ্র বস্তুতে তার আরম্ভ, বাইরে থেকে পরমাণুর দলকে আত্মস্মাৎ করে বেড়ে উঠতে থাকে। যে-সব পরমাণু থেকে এর উদ্ভব, তাদের সঙ্গে অন্য পরমাণুর মূলগত কোনো ভেদ নেই। অনুরূপ পরমাণুদলের সংযোগে গড়ে উঠেছে পাহাড়, এরোপ্লেন ও গাছ।

কিন্তু যে-সব সূত্র জীবদেহের পরমাণু নির্দেশ করছে তাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যার সাহায্যে তারা সহজবোধের ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে একটা অনুভূতির সাড়া জাগিয়ে তোলে। এই পরমাণুর দল প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আমাদের চৈতন্যের উপর ; কিন্তু বিশ্বের আর সব পরমাণুর প্রভাব অনুভূত হয় পরোক্ষভাবে, এদেরই মধ্যস্থতায়। চৈতন্যকে সহজেই এমন 'একটা-কিছু' ব'লে ধরে নিতে পারি যা বিশ্বছবির সম্পূর্ণ বাইরে, এই ছবির সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে শুধু আমাদের দেহের বিশ্ব-রেখার ভিতর দিয়ে।

তোমার চৈতন্য বিশ্বছবিকে স্পর্শ করে শুধু তোমার বিশ্ব-রেখার উপর দিয়ে, আমার চৈতন্য আমার বিশ্ব-রেখা দিয়ে। এই স্পর্শের ফলাফল প্রথমত 'কালের' যাত্রার ফলাফল ; মনে হয় আমাদের বিশ্ব-রেখার বিভিন্ন বিন্দুর উপর দিয়ে কেউ যেন আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই বিন্দুগুলি বিভিন্ন 'কালমাত্রায়' আমাদের অবস্থা নির্দেশ করে। আদি থেকে

অন্ত পর্যন্ত নিরবধি 'কাল' হয়তো বিশ্বছবিতে বিস্তৃত হয়ে আছে ; কিন্তু শুধু তার একটি মুহূর্তের সঙ্গে আমাদের যোগ, যেমন রাস্তার মাত্র একটি বিন্দুর সঙ্গে সাইকেলের চাকার সংস্পর্শ। ভায়েল বলেন, "ঘটনাবলী সংঘটিত হয় না, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে মাত্র।" ২৩ শতাব্দী পূর্বে 'টাইমোস'-এ (Timaeus) প্লেটো বলেছেন :

"অতীত ও ভবিষ্যৎ, কালেরই সৃষ্ট অংশবিশেষ ; অজ্ঞাতসারে, কিন্তু ভুল করে, আমরা এদের এক অনন্ত সত্তার উপর আরোপ করে থাকি। 'ভূত,' 'বর্তমান,' 'ভবিষ্যৎ' এ-সব কথা আমরা ব'লে থাকি, কিন্তু আসলে শুধু 'বর্তমান' শব্দেরই যথার্থ প্রয়োগ চলতে পারে।" ছবি ঝাড়তে একটি ঝাড়ন (dusting mop) ছবির উপর দিয়ে টেনে নেওয়া হয় ; এ-ক্ষেত্রে আমাদের চেতনা অনেকটা এই ঝাড়নে আবদ্ধ কোনো মাছির চেতনার মতোই। গোটা ছবি সামনে থাকা সত্ত্বেও, মাছি কেবলমাত্র সেই মুহূর্তেরই খবর পায় যে-মুহূর্তে সে ছবির সংস্পর্শে আসে ; যদিও ছবির উপর তার বর্তমান অবস্থিতির পিছনদিককার খানিকটা অংশের কথা তার মনে থাকতে পারে। হয়তো এমন ভ্রান্ত ধারণাও সে পোষণ করতে পারে যে, ছবির যে-সব অংশ তার সম্মুখে অবস্থিত তাদেরও সে আঁকবার সাহায্য করছে।

আবার এও হতে পারে, অসম্পূর্ণ ছবির উপর দিয়ে শিল্পী তুলি টেনে নিয়ে যাবার সময় তাঁর আঙুলে যে-অনুভূতির সঞ্চার হয়, আমাদের চেতনাকে সেই অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাহলে, ছবির অসম্পূর্ণ অংশকে প্রভাবান্বিত করার ধারণা নিছক ভ্রান্তির চেয়েও বেশি একটা-কিছু। আমাদের চেতনা এই ছবিকে কি ভাবে উপলব্ধি করে তার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষ কিছু বলতে পারে না, ছবির প্রকৃতি নিয়েই তার প্রধান কাজ।

যে-ঈথরকে এককালে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত বস্তু ব'লে মনে করা হত, সেই ঈথর আজ মিলিয়ে গেছে এক অবাস্তবতায়, শূন্য 'দেশের' এক ভূমিকায় ; পরমশূন্য থেকে উদ্ভূত এক বিশ্ব-বুদবুদের দেশমাত্রা (Spatial dimension) ছাড়া তার অন্য আর কোনো পরিচয় নেই। যে-তরঙ্গ-দলকে এককালে অনুমান করা হয়েছিল এই ঈথরে পরিচালিত ব'লে, তারাও প্রায় মিলিয়ে গেছে অবাস্তবে ; কালমাত্রা দিয়ে এই বুদবুদের মধ্যচ্ছেদের (on a cross-section of the bubble by time) উপর তারা যেন বন্ধুরতার নিদর্শন।

যে-ঈথর তরঙ্গ এককালে বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার উপর আরোপিত এই অবাস্তবতা ধর্ম অত্যধিক জটিল রূপ ধরে দেখা দিল 'ইলেকট্রন-তরঙ্গের' আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। যে-ঈথরের সাহায্যে সাধারণ বিকিরণের ব্যাখ্যার সুবিধা হয়, তা চতুর্মাত্রিক— 'দেশের' তিনমাত্রা ও 'কালের' একমাত্রার সমন্বয়। সব-কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন একটিমাত্র ইলেকট্রনের তরঙ্গ যে-ঈথরে ব্যাখ্যা করা হয় তাও চতুর্মাত্রিক। এই ঈথর ও পূর্বোক্ত ঈথরে ভেদ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে ; কিন্তু তারা অনুরূপ, কারণ উভয়েই 'দেশের' তিনমাত্রা ও 'কালের' এক মাত্রার সমন্বয়। কিন্তু দেশমাত্রায় অবস্থিত একটিমাত্র মুক্ত ইলেকট্রন, সম্পূর্ণ ঘটনাহীন বিশ্বের (perfectly eventless Universe) প্রতীক ; সব চেয়ে বৈশিষ্ট্যহীন চিন্তনীয় ঘটনার উদ্ভব হয় যখন দুটি ইলেকট্রনের পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে। এদের সংঘাতে কি ঘটবে তার সহজ ব্যাখ্যা করতে, তরঙ্গ-বলবিদ্যা একদল তরঙ্গের অবতারণা করেছে, এক সাতমাত্রার ঈথরে (a system of waves in an ether which has seven dimensions)—এই সাতমাত্রা হল 'দেশের' ছয়মাত্রা (দুটি ইলেকট্রনের প্রত্যেকটির তিনমাত্রা) ও 'কালের' একমাত্রা। তিনটি

ইলেকট্রনের সংঘাত নির্দেশ করতে এক দশমাত্রার ঈথরের প্রয়োজন—'দেশের' ন'মাত্রা (তিনটি ইলেকট্রনের প্রত্যেকটির তিনমাত্রা) ও 'কালের' একমাত্রা। 'কালের একমাত্রা' যদি অন্য আর সব মাত্রাকে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বেঁধে না রাখত, তাহলে প্রত্যেকটি ইলেকট্রন, এক একটি পৃথক ও পরস্পর সংযোগহীন ত্রিমাত্রিক 'দেশে', আবদ্ধ হয়ে থাকত। বিশ্বরচনার উপাদান বস্তুকে পরস্পর বেঁধে রাখতে এই 'কাল' যেন 'মসলার' (mortar) ভূমিকা গ্রহণ করেছে; যেমন, আধ্যাত্মিক স্তরে (spiritual plane), লাইব্‌নিৎসের (Leibnitz) 'বাতায়নহীন পৃথক প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ সত্তা' (windowless monads) এক সর্বগত মন দ্বারা পরস্পর সন্নিবদ্ধ। বাস্তবতার কাছাকাছি যেতে হলে ইলেকট্রনকে মনে করতে হবে 'চিন্তার বিষয়' ব'লে, আর 'কাল'কে ভাবতে হবে চিন্তনের প্রক্রিয়া (process of thinking) ব'লে।

অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানীই আশা করি এ-বিষয়ে একমত হবেন, যে-সাতমাত্রার 'দেশে', তরঙ্গ-বলবিদ্যা দুটি ইলেকট্রনের সংঘাত কল্পনা করেছে, তা নিছক অবাস্তব; তাই তাদের সহচর তরঙ্গের দলকেও অবাস্তব ব'লে ভাবতে হবে। এই সাতমাত্রার 'দেশ' সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রয়েডিন্‌গের বলেছেন—"এর একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃত অর্থ থাকলেও, 'অস্তিত্ব' আছে একথা বলা যায় না; তাই সাতমাত্রার 'দেশে' তরঙ্গ গতির 'অস্তিত্ব' আছে, অস্তিত্ব শব্দের সাধারণ অর্থে একথা বলতে পারি না। এ হল যা-ঘটে তার একটা গাণিতিক বর্ণনা। একটি মাত্র ইলেকট্রন সম্বন্ধেও, হয়তো অতি সাধারণ অর্থেও, তরঙ্গ-গতির 'অস্তিত্বের' কথা বলা সঙ্গত হবে না; যদিও এই বিশেষ ক্ষেত্রের 'দেশ,' সাধারণ 'দেশের' সঙ্গে একেবারে মিলে যায়।" দুই দল তরঙ্গের মধ্যে একদলের উপর কি করে অপেক্ষাকৃত কমমাত্রার বাস্তবতা (lower degree of reality) আরোপ করা যেতে পারে

তা বোঝা কঠিন। পৃথক ইলেকট্রনের তরঙ্গ বাস্তব, আর যুগল ইলেকট্রনের তরঙ্গ অবাস্তব, একথা বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। পৃথক ইলেকট্রনের তরঙ্গ এতটা বাস্তব যে ফোটোগ্রাফের প্লেটে তার ছাপ পর্যন্ত উঠেছে (২নং প্লেট)। পৃথক ও যুগল ইলেকট্রনের তরঙ্গ, অধ্যাপক টম্‌সনের প্লেটে তোলা তরঙ্গ, অর্থাৎ সব তরঙ্গই সমমাত্রায় বাস্তব বা অবাস্তব এরূপ কল্পনা করলে তবে পূর্ণ সঙ্গতি ফিরে পাওয়া যায়।

কোনো কোনো পদার্থবিজ্ঞানী ইলেকট্রন-তরঙ্গকে 'সম্ভাবনার তরঙ্গ' (waves of probability) ব'লে স্বীকার করে এই সমস্যার একটা মোটামুটি ব্যবস্থা করলেন। জোয়ারের ঢেউ বলতে বোঝায় জলের একটা বাস্তব ঢেউ, যা তার গতিপথের সব কিছুই সিক্ত করে দেয়; তাপের ঢেউ বলতে বুঝি এমন একটা কিছু (যদিও বাস্তব নয়), যা তার অগ্রগতির পথে সব কিছুই উত্তপ্ত করে দেয়। কিন্তু কাগজে যখন দেখি কোথাও আত্মহত্যার ঢেউ (suicide-waves) লেগেছে, তখন একথা বলা যায় না যে সেখানকার প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মহত্যা 'করবে'; শুধু এটুকু বলতে পারি যে তার আত্মহত্যা করার সম্ভাবনা বেড়েছে। আত্মহত্যার কোনো ঢেউ যদি কলকাতার উপর দিয়ে যায়, তাহলে দেখা যাবে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর হার সেখানে বেড়েছে। যদি বলা হয় রবিন্‌সন্ ক্রুসোর দ্বীপের মতো কোনো কাল্পনিক দ্বীপে এই ঢেউ লেগেছে, তাহলে বুঝব যে সেখানকার প্রত্যেক অধিবাসীর আত্মহত্যা করার 'সম্ভাবনা' বেড়েছে। তরঙ্গ-বলবিদ্যায় 'ইলেকট্রন-তরঙ্গ' বলতেও হয়তো এই ধরনের কোনো সম্ভাবনার তরঙ্গ বোঝায়; কোনো এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে এই তরঙ্গের তীব্রতা (intensity) ঐ বিন্দুতে ইলেকট্রনের উপস্থিতির সম্ভাবনার পরিমাপ নির্দেশ করে।

অধ্যাপক টম্‌সনের প্লেটের (২ ও ৩নং ছবি, ২নং প্লেট) প্রতি বিন্দুতে যে-তরঙ্গতীব্রতা (wave-intensity) তা ঐ বিন্দুতে একটিমাত্র বিক্ষিপ্ত

ইলেকট্রনের আঘাতের সম্ভাবনার পরিমাপ নির্দেশ করে। একদল বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের মধ্যে কতগুলি ইলেকট্রন এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে আঘাত করবে, তা প্রত্যেকটি পৃথক ইলেকট্রনের ঐ বিন্দুতে আঘাত করার সম্ভাবনার সঙ্গে সমানুপাতিক হবে। তাই প্লেট সেখানে যে-মাত্রায় কালো হয় তা ইলেকট্রন-পিছু আঘাতের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

ইলেকট্রন-তরঙ্গ সম্বন্ধে এই ধারণার একটা মস্ত সুবিধা এই যে তার সাহায্যে ইলেকট্রনের সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই তরঙ্গ যথার্থ বাস্তব-তরঙ্গ (material waves) হলে, প্রত্যেকটি তরঙ্গদল পরীক্ষায় হয়তো বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ত ; তাই বিক্ষিপ্ত রশ্মিতে কোনো বৈদ্যুতকণার সন্ধান পাওয়া যেত না। বস্তুতঃ জড়বস্তুর সঙ্গে সংঘাত ঘটলেই ইলেকট্রন ভেঙে পড়ত, তার চিরস্থায়ীতার দাবী থেকে বঞ্চিত হত। আসলে যা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে তা ইলেকট্রনদলের সমষ্টি, পৃথক ইলেকট্রন নয় ; পৃথক ইলেকট্রন বস্তুকণা-রূপে চালিত হয়ে তার বস্তুধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখে।

হাইসেন্‌বার্গ প্রবর্তিত 'অনির্দেশ্যবাদের' সঙ্গে এ-সব তথ্যের পূর্ণসঙ্গতি রয়েছে (৫৭ পৃষ্ঠা) ; এই মতবাদ অনুসারে কখনও একথা বলা যায় না, "'এই' নির্দিষ্ট বিন্দুতে ইলেকট্রন এখন রয়েছে, আর ঘণ্টায় 'এত' মাইল তার গতি।" ডিরাকের সাধারণ সূত্রের সঙ্গে এই মতবাদের মিল রয়েছে (৬০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ইলেকট্রন-তরঙ্গের পূর্ণপ্রকৃতি নির্দেশ করতে শুধু এই দুটি সূত্রই যথেষ্ট নয়।

হাইসেন্‌বার্গ ও বোর (Bohr) বলেন, ইলেকট্রনের সম্ভাব্য অবস্থা ও স্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার একটা বিশেষ প্রতীক ব'লে এই তরঙ্গদলকে মনে করতে হবে। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে এদেরও পরিবর্তন ঘটবে ; এরা তখন অবাস্তব হয়ে দাঁড়াবে। এই তরঙ্গদলকে 'দেশ' ও 'কালের' সীমায় নির্দিষ্ট ব'লে মোটেই ভাবা যায় না ;

একটা পূর্ণ অবাস্তব তরঙ্গধর্মের গাণিতিক সূত্রের উপলব্ধি ছাড়া এদের সম্বন্ধে আর কোনো ধারণাই আমাদের নেই।

বোর একটা অভিনব সম্ভাবনার কথা বলেন—প্রকৃতির সূক্ষ্মতম ঘটনাবলীকেও 'দেশ-কালের' সীমায় নির্দেশ করা যায় না; অবাধ শূন্যে (free space) বৃহৎ পরিমাপের ঘটনাবলী ও বিকিরণ, আপেক্ষিকবাদ প্রবর্তিত 'চতুর্মাত্রিক নিখিলে' সীমাবদ্ধ; অন্যান্য ঘটনাবলী এই নিখিলের সীমাবহির্ভূত। যেমন, চৈতন্যকে নিখিলের সীমাবহির্ভূত 'একটা-কিছু' ব'লে আগেই কল্পনা করা হয়েছে, কেমন করে তুটি ইলেকট্রনের সংঘাতকে সাতমাত্রায় নির্দেশ করা যায় তাও বলা হয়েছে। মনে করা যেতে পারে, নিখিলের সীমার বাইরে সংঘটিত ঘটনাবলী তার অন্তর্ভূত 'ঘটনাবলীর ধারা' নির্ধারিত করছে, আর বহুমাত্রার অন্তর্গত ঘটনাবলীকে জোর করে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় সীমাবদ্ধ করতে গেলেই প্রকৃতিতে আপাত অনির্দেশ্যতার উদ্ভব হয় (apparent indeterminacy of nature may arise merely from our trying to force happenings which occur in many dimensions into a smaller number of dimensions)। ধরে নেওয়া যাক, এমন এক ধরনের অন্ধপ্রাণী আছে যাদের অনুভূতি পৃথিবীপৃষ্ঠের তুই মাত্রায় সীমাবদ্ধ। সময় সময়, কোনো কোনো স্থান জলে ভিজে যায়; আমাদের অনুভূতি 'দেশের' তিনমাত্রায় নিবদ্ধ, আমরা এই ঘটনার নাম দিয়েছি বৃষ্টিপাত। কোন জায়গা ভিজবে আর কোন জায়গা শুকনো থাকবে, 'দেশের' তৃতীয় মাত্রায় নিবদ্ধ ঘটনাবলী তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত করে। কিন্তু যারা তুইমাত্রার প্রাণী, যাদের কাছে 'দেশের' তৃতীয় মাত্রার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তারা যদি সমগ্র প্রকৃতিকে তুইমাত্রার পরিসীমায় নিবদ্ধ করতে চায় তাহলে শুষ্ক ও সিক্ত অংশের সংস্থানের নির্দেশ্যতা (determinism) নির্ণয় করতে

তারা অসমর্থ হবে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের শুষ্কতা ও সিক্ততার 'সম্ভাবনাই' শুধু তারা নির্দেশ করতে পারবে, আর এই 'সম্ভাবনাকেই' চরম সত্য ব'লে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করবে না। যদিও বিচারের সময় এখনও আসেনি, তবু আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থায় এই হল সব চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা। কোনো বস্তু আলো ও দেয়ালের মাঝে রাখলে, দেয়ালে তার ছায়া পড়ে, এই ছায়া যেমন ত্রিমাত্রিক বাস্তবতার (three dimensional reality) দুই মাত্রায় অভিক্ষেপ (projection), তেমনি 'দেশ-কালে' সীমাবদ্ধ নিখিলের অন্তর্গত ঘটনাবলী হয়তো বহুমাত্রিক বাস্তবতার চতুর্মাত্রায় অভিক্ষেপ। তাই 'দেশ-কালে' সীমাবদ্ধ ঘটনাবলী, শ্রেণীবদ্ধ সচল ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের মায়াজাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

(···no other than a moving row
of Magic Shadow-shapes that come and go.)

ঘটনাবলীর যথাযথ ব্যাখ্যা করতে ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌছতে অসংখ্য গাণিতিক ছবি থাকা সত্ত্বেও শুধু তরঙ্গ-বলবিদ্যার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়াতে, হয়তো আপত্তি উঠতে পারে, কারণ এই বলবিদ্যাও একটি গাণিতিক ছবিমাত্র।

স্বীকার করতে হবে, তরঙ্গ-বলবিদ্যার ছবি কোনো অভিনবত্বের দাবী করতে পারে না। অন্য ছবিরও উদ্ভব হয়েছে, বিশেষ করে হাইসেনবার্গ ও ডিরাক প্রবর্তিত ছবি। পৃথক ও দুরূহ ভাষায় এদের বর্ণনা করা হলেও আসলে কিন্তু এরা একই কথা বলে। শ্রয়েডিংগের ও ডি ব্রগ্‌লির তরঙ্গ-বলবিদ্যা প্রকৃতির ঘটনাবলীর যতটা সহজ ব্যাখ্যা করেছে, আর কোনো বলবিদ্যার সাহায্যে তা সম্ভব হয়নি। ২নং প্লেটে যে ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছে তার থেকে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রকৃতির পরিকল্পনায়,

নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গদল (waves of definite wavelength), কি ভাবে জানি না, মৌলিকত্বের দাবী নিয়ে এসে হাজির হয়েছে, এরা তরঙ্গ-বলবিদ্যার মূল প্রত্যয় (fundamental concept), কিন্তু অন্যান্য বলবিদ্যায় অবান্তর উপসর্গ মাত্র। অন্যান্য বলবিদ্যার তুলনায় তরঙ্গ-বলবিদ্যা, তার সহজাত সরলতার জন্য, প্রকৃতির অন্তরতম রহস্য অবারিত করতে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে; তাই অন্যান্য বলবিদ্যা ধীরে ধীরে নেপথ্যে সরে যাচ্ছে। অস্থায়ী ভূমিকারূপে তারা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছে, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

একটিমাত্র বিশ্বছবিতেই যদি নিবদ্ধ থাকতে হয়, তাহলে তরঙ্গ-বলবিদ্যা যে-ছবির অবতারণা করেছে তাকেই বেছে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত, যদিও হাইসেনবার্গ বা ডিরাক প্রবর্তিত মতবাদ প্রায় একই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়। মূলকথা এই, বর্তমানে বিশ্বপ্রকৃতির যে-সব ছবি বিজ্ঞান উপস্থিত করেছে, আর পরীক্ষাধীন তথ্যের সঙ্গে যাদের পূর্ণসঙ্গতি রয়েছে, তাদের 'সবই' গাণিতিক ছবি।

প্রায় সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে এ-সব ছবি নিছক কাল্পনিক; অবাস্তবও বলা যেতে পারে, অবশ্য অবাস্তব বলতে যদি এই বোঝায় যে চরম বাস্তবতার (ultimate reality) সঙ্গে বিজ্ঞানের এখনও পরিচয় ঘটেনি। অনেকেই মনে করেন, দর্শনের যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে আপেক্ষিকবাদ ও তার সাহায্যে দেশ-কালের অচ্ছেদ্য সংযোগ সাধন, বা কণিকাবাদ ও তার কার্যকারণসম্বন্ধের অবসান ঘোষণা, বা পরমাণুর ব্যবচ্ছেদে বস্তুর মূলপ্রকৃতির ধারণার আমূল পরিবর্তন, এদের কোনোটিকেই বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের অসাধারণ কীর্তি বলা যায় না; 'চরম বাস্তবতা এখন পর্যন্তও আমাদের অজ্ঞাত' এই তথ্যের সাধারণ স্বীকৃতিই তার সব চেয়ে বড় দান। প্লেটোর সুপরিচিত রূপকের ভাষায়

বলতে হয়—"আলো পিছনে রেখে এখনও আমরা গুহায় আবদ্ধ, সামনে দেয়ালের উপর শুধু ছায়াটাকেই দেখছি, আসল বস্তু কিন্তু রয়েছে আমাদের পিছনে, দৃষ্টির অন্তরালে।" বর্তমানে, বিজ্ঞানের একমাত্র কাজ হল এই ছায়াগুলিকে সম্যক পরীক্ষা করা, তাদের পর্যায়ভুক্ত করা ও সব চেয়ে সহজ উপায়ে তাদের ব্যাখ্যা করা। নূতন জ্ঞানধারার মধ্যে দেখতে পাই অন্য যে-কোনো পদ্ধতির চেয়ে একমাত্র গাণিতিক পদ্ধতিই অধিকতর স্পষ্ট, বিশদ ও স্বাভাবিক রূপে এদের ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা গণিতশাস্ত্রের ধারণাবলীতেই সীমাবদ্ধ। 'প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ গাণিতিক ভাষায় লেখা'—যে-অর্থে গ্যালিলিও একথা বলেছেন, তার চেয়ে খানিকটা পৃথক অর্থে, বর্তমান ক্ষেত্রে একথা সত্যি (Nature's great book is written in mathematical language)। কথাটা এত সত্যি যে, বিজ্ঞানের যে-সব শাখা (অর্থাৎ আপেক্ষিকবাদ, কণিকাবাদ, ও তরঙ্গ-বলবিদ্যা) প্রকৃতির মূল রহস্য অবারিত করতে সচেষ্ট, তাদের সম্যক উপলব্ধি করা গণিতবেত্তা ছাড়া আর কেউ কখনও আশা করতেই পারেন না।

আমাদের গুহার দেয়ালে বাস্তবতা যে-ছায়া ফেলে তা নানা জাতীয় হতে পারে। যে-পরীক্ষাগারে আলোকচিত্রের সাহায্যে অনুতম জীব-কোষের বৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ একটা কুকুর ঢুকে পড়লে তার কাছে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য যতটা অর্থহীন হবে, এই ছায়াগুলিও আমাদের কাছে ঠিক ততটা অর্থহীন ব'লেই মনে হতে পারে। সমগ্র বিশ্বলোকের তুলনায় পৃথিবী নিতান্তই এত ছোট, ও যতদূর জানি, সমগ্র মহাশূন্যে একমাত্র চিন্তাশীল জীব হিসেবে আমাদের আবির্ভাব এত আকস্মিক, আর বিশ্বপরিকল্পনার মূলধারা থেকে আমরা এত দূরে বিচ্ছিন্ন যে, বিশ্বসমগ্রতার অর্থ যাই হোক না কেন, তা আমাদের পৃথিবীস্থ

অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমাদের আয়ত্তসীমার বহু ঊর্ধ্বে বিরাজিত থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তাই তার অর্থ হবে আমাদের বুদ্ধির অতীত। এখানে এমন কোনো অবলম্বন আমাদের নেই যেখান থেকে বিশ্বপ্রকৃতির মূল অর্থ পরিসন্ধানে যাত্রা শুরু করতে পারি (No foothold from which to start our exploration of the true meaning of the universe)।

যদিও এরূপ ঘটনাই সব চেয়ে সম্ভব, তবু এমনও হতে পারে যে গুহার দেয়ালে-পড়া কতকগুলি ছায়া, গুহাস্থিত আমাদের পূর্বপরিচিত বস্তু বা প্রক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেবে। নিম্নগামী বস্তুর ছায়ার আচরণ নিম্নগামী বস্তুরই মতো ব'লে, এই ছায়া, যে-বস্তুকে আমরা নিচের দিকে ফেলেছি, তারই কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়; তাই এ-সব ছায়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করতে আমরা প্রলুব্ধ হই। গত শতাব্দীর যান্ত্রিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা এর থেকেই পাওয়া যায়। এই ছায়াগুলিই পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের জেলি, লাটিম ইত্যাদির আচরণের কথা মনে করিয়ে দেওয়ায়, তাঁরা ভুল করে 'ছায়াকেই' 'বস্তু' ব'লে গ্রহণ করেছিলেন; তাই তাঁদের এই বিশ্বাস হয়েছিল যে জেলি ও যন্ত্র সম্বলিত এক বিশ্বে তাঁদের বাস। এখন জানা গেছে, এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা একেবারে অসম্পূর্ণ —আলোকের পরিচলন, বিকিরণের উদ্ভব, বস্তুর নিম্নগতি বা পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের ঘূর্ণিনাচ, এ-সব অতি সাধারণ ঘটনার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা অসম্ভব।

আবার, গুহার বাইরে সূর্যের আলোকে দাবা খেলার ছায়া, গুহার ভিতরে আমরা যে এই খেলা খেলেছি তার কথা মনে করিয়ে দেয়। কখনও কখনও এই ছায়ার মধ্যে হয়তো দেখতে পাব ঘোড়ার 'চাল', রাজা ও মন্ত্রীর সঙ্গে নৌকার 'চাল' বা আমাদের পূর্বপরিচিত এমন

এমন সব বিশিষ্ট ধরনের 'চাল' যাদের আকস্মিক বলা যায় না। বহির্বাস্তবতাকে (external reality) আর যন্ত্র ব'লে মনে করা যায় না; এর কর্মপদ্ধতির খুঁটিনাটি অংশ হয়তো যান্ত্রিক হতে পারে, কিন্তু মূলত এই বাস্তবতা হল চিন্তাপ্রসূত বাস্তবতা (reality of thought)। গুহার বাইরে যারা দাবা খেলছে তাদের, আমাদেরই মতো মন দ্বারা পরিচালিত প্রাণী ব'লে চিনতে পারব; যে-বাস্তবতা আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির চিরঅন্তরালে ছিল তারই মধ্যে আমাদের চিন্তার প্রতিরূপ দেখতে পাব।

ঘটনাবহুল জগৎ, অর্থাৎ আমাদের মনের দেয়ালে প্রকৃতি যে-সব ছায়া ফেলে, তাদের সম্যক পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী দেখেছেন যে, এই ছায়াগুলি একেবারে দুর্বোধ্য নয়, অজ্ঞাত বা অপরিচিত বস্তুর ছায়া ব'লে এদের মনে হয় না। আমার মনে হয়, গুহার বাইরে এই দাবা খেলোয়াড়ের দল যেন আমাদের পরিচিত; গুহার ভিতরে খেলার যে-নিয়মাবলী আমরা বেঁধেছি তার সঙ্গে খেলোয়াড় দলের যেন ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। বহির্জগতের অভিজ্ঞতা প্রায় বাদ দিয়ে, শুধু অন্তর্চেতনা-বোধ (inner consciousness) থেকে গণিতবেত্তা 'শুদ্ধ-গণিতের' (pure mathematics) যে-সব নিয়মাবলী গঠন করেছেন, মনে হয় তাদের সঙ্গে প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় আছে। 'শুদ্ধ-গণিত' বলতে গণিতশাস্ত্রের সে-সব বিভাগকে বোঝায় যাদের উদ্ভব 'শুদ্ধ-চিন্তা' থেকে (pure thought), শুধু মনোরাজ্যের সীমায় নিবদ্ধ যুক্তি থেকে যাদের সৃষ্টি; এর বিপরীত হল 'ব্যবহারিক গণিত' (applied mathematics), যা বহিঃপ্রকৃতির কোনো কল্পিত ধর্মকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগে বহির্জগৎ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। পর্যবেক্ষণ প্রয়োগে দুষ্ট নয়, এরূপ শুদ্ধ-চিন্তাপ্রসূত ফলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডেকার্টে এই তথ্য

বেছে নিলেন যে "একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হবে দুই সমকোণ।" এখন জানা গেছে, একমাত্র এই নির্বাচনেরই ভাগ্য মন্দ। এর চেয়ে ঢের কম আপত্তিজনক দৃষ্টান্ত সহজেই বেছে নেওয়া যেত—যেমন, অনির্দেশ্যতার নিয়মাবলী, কাল্পনিক-সংখ্যা প্রয়োগ পদ্ধতির নিয়মাবলী (rules of manipulation of 'imaginary' numbers) (নিগেটিভ রাশির বর্গমূল সম্বলিত সংখ্যাকে কাল্পনিক-সংখ্যা বলা হয়), বা বহুমাত্রিক জ্যামিতি (multidimensional geometry)। বহির্জগতের সংস্পর্শে প্রভাবান্বিত না হয়েও অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে, গণিতবেত্তা শুধু চিন্তাশক্তি দিয়েই এ-সব গণিতের শাখা গড়ে তুলেছিলেন ; তাঁরা গড়েছেন—"সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন এক স্বতন্ত্র জগৎ, নিছক বুদ্ধি দিয়ে গড়া" (an independent world created out of pure intelligence)। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ছায়া-অভিনয়ের (shadow-play) (যেমন বস্তুর নিম্নগতি, জোয়ার ভাঁটা, পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের গতি) অভিনেতার দল এ-সব গাণিতিক ধারণার সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের দাবাখেলার নিয়মাবলীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ; দেয়ালের ছায়াগুলিও দাবা খেলছে এ-তথ্য আবিষ্কারের বহুপূর্বেই এ-সব নিয়মাবলী সুসম্বদ্ধ করা হয়েছিল।

বস্তুর চরম প্রকৃতি সম্বন্ধে সব আলোচনাই ব্যর্থ হবে যদি তাদের তুলনা করার জন্য বাইরের কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড না থাকে ; ছায়ার পিছনে যে-বাস্তবতা রয়েছে তার মূল প্রকৃতি নির্দেশ করতে গেলেই এই তথ্য তার এক প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই লক-এর (Lock) ভাষায় বলতে হয়—"বস্তুর মূলপ্রকৃতি চির অজ্ঞেয়" (the real essence of substances is for ever unknowable)। যে-নিয়মাবলীর সাহায্যে বস্তুর পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় ও বহির্জগতের ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়, এক্‌-

মাত্র তাদের আলোচনা থেকেই ক্রমোন্নতি সম্ভব। আমাদের মনের অবাস্তব সৃষ্টির সঙ্গে এদের তুলনা করতে পারি।

"এক 'শুদ্ধ-গণিতবেত্তা' এই বিশ্বের স্রষ্টা," এই সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়েছে বিশ্বকর্মধারার বৈজ্ঞানিক আলোচনা থেকে; এই সিদ্ধান্তের ভাষা স্পষ্টও নয়, সম্পূর্ণও নয়, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা থেকে যে-ভাষার উদ্ভব হয়েছে তা ছাড়া অন্য ভাষা আমাদের নেই।

এই কথার ঘোরতর প্রতিবাদ উঠবে, কারণ আমাদের পূর্বজ্ঞান থেকেই শুধু আমরা প্রকৃতির রূপ গড়ে তুলছি। সঙ্গীত বিশারদ সঙ্গীতে এতটা তন্ময় হয়ে থাকতে পারেন যে, যে-কোনো প্রক্রিয়াকেই তিনি সঙ্গীতযন্ত্র ব'লে ব্যাখ্যা করতে দ্বিধা করবেন না; সব ব্যবধানকেই স্বরমাত্রার (musical intervals) ব্যবধান ব'লে চিন্তা করার অভ্যাস তাঁকে এতটা আচ্ছন্ন করে রাখে যে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ার (সময়ের যে-ব্যবধানে তিনি বিভিন্ন সিঁড়িতে আঘাত পেয়েছেন) ব্যাপারেও তিনি সঙ্গীতের প্রকাশ কল্পনা করবেন।

'কিউবিষ্ট' শিল্পী (Cubist painter—Cubism হল শিল্পের এক আধুনিক ধারা যার সাহায্যে বস্তুর রূপ প্রদর্শনে কতকগুলি জ্যামিতিক ক্ষেত্রের সন্নিবেশ ব'লে মনে হয়) প্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে কতকগুলি জ্যামিতিক ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো কিছুর সন্ধান পান না; তাঁর ছবির অবাস্তবতা থেকেই ধরা পড়ে, প্রকৃতিকে সম্যক উপলব্ধি করা থেকে তিনি কতদূরে রয়েছেন। 'কিউবিষ্ট' কাঁচে (Cubist spectacles) তাঁর চোখ ঢাকা, তাই দৃষ্টিসীমা হয়েছে ব্যাহত; বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর কিছুই তাঁর চোখে পড়ে না। আবার গণিতবেত্তা প্রকৃতিকে দেখেন, শুধু তাঁর গাণিতিক কাঁচের ভিতর দিয়েই। কাণ্টের (Kant) কথা মনে পড়ে যায়—যে-বিভিন্ন

অনুভূতির সাহায্যে মানুষের 'মন' প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে তাদের আলোচনা থেকে কাণ্ট এই সিদ্ধান্ত করেন "গাণিতিক-কাঁচের ভিতর দিয়েই প্রকৃতির রূপ নির্ধারণ করতে মনের একটা সহজাত বিশেষ ঝোঁক আছে।" নীল রঙের কাঁচ দিয়ে যেমন সমস্ত পৃথিবীকে নীল দেখায়, তেমনি কাণ্ট ভাবলেন যে মনের এই স্বাভাবিক ঝোঁক নিয়ে আমরা শুধু একটা গাণিতিক জগৎই দেখতে পাই। আমাদের যুক্তি কি সেই পুরানো ফাঁদের (যদি ফাঁদ ব'লেই তাকে বলা হয়) দিকেই আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে?

একটু ভাবলেই দেখা যাবে, বলার কথা এতেই শেষ হয়ে যায়নি। প্রকৃতির নূতন গাণিতিক ব্যাখ্যা সবই আমাদের মনশ্চক্ষুর ভিতর দিয়ে হতে পারে না, অর্থাৎ আত্মগত রূপকল্পনায় বহির্জগতের সব কিছু ব্যাখ্যা করা চলে না; যদি তাই হত তাহলে অনেক আগেই তা ধরা পড়ত। মানুষের মনের প্রকৃতি ও ক্রিয়া একশো বছর আগেও যা-ছিল এখনও ঠিক তাই আছে; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আধুনিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিপুল প্রগতি, মানুষের মনের কোনো পরিবর্তন নয়। বাস্তব বহির্জগতে নূতন ও অজ্ঞাতপূর্ব 'একটা কিছুর' সন্ধান আমরা পেয়েছি। আমাদের দূরতম পূর্বপুরুষ তাঁদের নরত্ববোধের ধারণা (anthropomorphic concepts) দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন; প্রকৃতিকে যান্ত্রিক ধারায় ব্যাখ্যা করতে নিকটতর পূর্বপুরুষদের প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের তৈরি এ-দুটি ছাঁচে প্রকৃতি ধরা দিল না। কিন্তু 'শুদ্ধ-গণিতের' ধারণার সাহায্যে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার সমস্ত চেষ্টাই এ-পর্যন্ত অত্যধিক সফলতা লাভ করেছে। একথা এখন সন্দেহের অতীত ব'লেই মনে হয় যে, কি করে জানি না, জীববিদ্যা বা যন্ত্রবিদ্যার ধারণার চেয়ে 'শুদ্ধ-গণিতের' ধারণার সঙ্গেই প্রকৃতির আত্মীয়তা

বেশি। গাণিতিক ব্যাখ্যা মানুষের তৈরি 'তৃতীয় ছাঁচ' হয়ে থাকলেও, তা পূর্ববর্তী দুটি ছাঁচের চেয়ে বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে অনেক বেশি খাপ খায়। একশো বছর আগে বিজ্ঞানীর দল যখন প্রকৃতির যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত, তখনও কোনো 'জ্ঞানী ব্যক্তি' একথা তাঁদের ব'লে দেননি যে পরিণামে এই যান্ত্রিক ধারণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে—এই ঘটনাসম্বলিত বিশ্ব সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে যদি না তাকে 'শুদ্ধ-গণিতের' পর্দার উপর ফেলা হয় (projected on to a screen of pure mathematics)। যুক্তি দেখিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি যদি পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিতেন, তাহলে বিজ্ঞানের পণ্ডশ্রম অনেকখানি লাঘব হত। এখন যদি কোনো দার্শনিক বলেন, "যা-কিছু এখন জানা গেছে, কিছুই নূতন নয়; অনেক আগেই আমি একথা ব'লে দিতে পারতাম।" বিজ্ঞানী হয়তো সঙ্গে সঙ্গে এই জবাব দেবেন, "একথা আগে বলাই উচিত ছিল, তাহলে আর আমাদের কষ্ট স্বীকার করে এ-সব যথার্থ মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করার প্রয়োজন হত না।"

আমাদের কথা হল এই যে, কাণ্টের ধারণা থেকে এক পৃথক অর্থে, বিশ্বপ্রকৃতিকে এখন গণিতের অন্তর্ভূত ব'লে মনে হয়; সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়, বিশ্বপ্রকৃতিতে গণিতের আবির্ভাব উপর থেকে, নিচে থেকে নয়। একটা বিশেষ অর্থে একথা বলা যায় যে "সব কিছুই গাণিতিক।" গণিতের সব চেয়ে সহজ রূপ হল পাটীগণিত (arithmetic), সংখ্যা ও রাশির বিজ্ঞান—এরাই আমাদের সমস্ত জীবনে অনুপ্রবিষ্ট। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য হল পাটীগণিতের প্রক্রিয়ার অন্তর্গত জমা-খরচ ও হিসেব-নিকেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তাই এক অর্থে এ হল একটা গাণিতিক জীবিকা। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বকে যে গণিতের অন্তর্গত ব'লে মনে হয়, তা মোটেই এই অর্থে নয়।

প্রত্যেক এঞ্জিনিয়রেরই গণিতশাস্ত্রে খানিকটা দখল থাকা দরকার ; নিখুঁত ভাবে বস্তুর যান্ত্রিক আচরণ হিসেব ও অনুমান করতে তাঁকে গাণিতিক জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে ও সমস্যাগুলিকে গাণিতিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে হবে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও, বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতিকে যে-গাণিতিক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে, তা মোটেই এ-ভাবে নয়। শুধু জটিলতার আধিক্যে এঞ্জিনিয়রের গণিত, ব্যবসায়ীর গণিত থেকে স্বতন্ত্র ; হিসেবের যন্ত্র ছাড়া এই গণিত আর কিছুই নয়, লাভ ও মূলধনের হিসেব না করে সে চাপ, টান বা বিদ্যুৎ প্রবাহের মান নির্ণয় করে।

প্লুটার্ক (Plutarch) লিখে গেছেন "প্লেটো একথা বলতেন—বিশ্বস্রষ্টা চিরদিন জ্যামিতিকরণে মগ্ন" (God for ever Geometrises)—প্লেটোর একথার অর্থ কি তার আলোচনার জন্য প্লুটার্ক এক কাল্পনিক আলোচনা-কেন্দ্রের (imaginary symposium) অবতারণা করেন। "ধনী (Banker) চিরদিন পাটীগণিতকরণে (arithmetises) ব্যাপৃত" —একথার অর্থ থেকে প্লেটোর কথার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। প্লুটার্কের দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে—প্লেটো বলেছেন, অসীমের মধ্যে সীমা নির্দেশ করে জ্যামিতি ; পাঁচটি সম ঘনবস্তুকে (five regular solids) মূলভিত্তি করে ভগবান এই বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে, মাটি, বায়ু, অগ্নি ও জলের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ) কণার আকৃতি হল যথাক্রমে ঘন, অষ্টফলক, চতুস্ফলক ও বিংশফলক (cube, octahedra, tetrahedra and icosahedra) বস্তুর আকৃতির মতো ; কিন্তু বিশ্বের আকৃতি হল দ্বাদশফলক বস্তুর মতো (dodecahedron)। প্লেটোর আবার এই বিশ্বাস ছিল—সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহের দূরত্বমাত্রা "দ্বিগুণ ব্যবধানের অনুপাতিক" (in the proportion of the double intervals), অর্থাৎ ২ বা ৩-এর ঘাত সমন্বিত পূর্ণাঙ্ক রাশির ক্রম-

পর্যায় (sequence of integers which are powers of 2 or 3)—যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৮, ৯ ও ২৭।

এ-সব আলোচনার যদি কোনো মূল্য আজও থেকে থাকে, তাহলে শুধু প্রথমটিরই কিছু আছে—শুধু জ্যামিতিক ব'লেই, আপেক্ষিকবাদ প্রবর্তিত বিশ্ব হয়েছে সসীম। চতুর্ভূত (four elements) ও বিশ্ব পাঁচটি সম ঘনবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, এ হল নিছক কল্পনা ; আর সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহের প্রকৃত দূরত্বমাত্রার সঙ্গে প্লেটোর সংখ্যাগুলির কোনো সম্বন্ধ নেই। প্লেটোর দু'হাজার বছর পর কেপ্‌লার (Kepler) গ্রহদলের কক্ষপথের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গীতের স্বরমাত্রার অন্তরা (musical intervals) ও জ্যামিতিক অঙ্কনকে সম্বন্ধযুক্ত করতে বহু চেষ্টা করেছেন ; হয়তো তাঁরও এই বিশ্বাস ছিল যে এই কক্ষপথগুলিকে পর পর সাজিয়ে রেখেছে কোনো সঙ্গীতবিদ বা জ্যামিতিবিদ (Musician or Geometer)। বস্তুতঃ এক সময় তাঁর এ ধারণা হয়েছিল যে এই কক্ষপথগুলির অনুপাতের সঙ্গে এই পাঁচটি সম ঘনবস্তুর জ্যামিতির সম্বন্ধ তিনি নির্ণয় করেছেন। এই তথ্য প্লেটো জানতে পারলে, বিশ্বস্রষ্টার জ্যামিতিকরণের ঝোঁক সম্বন্ধে কী স্পষ্ট প্রমাণই না পেতেন! কেপ্‌লার লিখেছেন, "এই আবিষ্কারে যে-অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।" বলা বাহুল্য এই মস্ত আবিষ্কার ভুল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ আধুনিক ব্যক্তিমাত্রই একে হেসে উড়িয়ে দেবে ; সৌরলোককে একটা সুসম্পূর্ণ সৃষ্টি (finished product) অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্তও সে এক অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে, এরূপ মনে করা অসম্ভব। সৌরলোককে শুধু ভাবতে পারি নিয়ত পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান একটা কিছু ব'লে, অতীত অবস্থা থেকে নিজের ভবিষ্যৎ রচনার কাজে ব্যাপৃত। এক মুহূর্তের জন্যে যদি আমাদের চিন্তাধারাকে

মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাই ও কেপ্‌লারের সিদ্ধান্তকে সত্য ব'লে স্বীকার করি, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাব যে এই সিদ্ধান্ত থেকে তাঁর আরও কিছু অনুমান করা উচিত ছিল। বিশ্ব-রচনার মূলে যে-গণিতের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর প্রয়োগ-করা গণিতের চেয়ে আরও কিছু বেশি ; তাই তাঁর বলা উচিত ছিল "বিশ্বের রচনাবৈশিষ্ট্য নির্ধারিত করতে যে-গণিত আমি প্রয়োগ করেছি তার অতিরিক্ত আরো এক গণিতও বিশ্বে সহজাত রয়েছে।" এ যুক্তিও তিনি দেখাতে পারতেন, তাঁর আবিষ্কার এই নির্দেশ দিচ্ছে যে বিশ্বরচনার মূলে রয়েছে এক জ্যামিতিবিদ। ছোট একটা মাছকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে বড় একটা মাছ ধরার পর মৎসশিকারী যেমন এই সমালোচনায় কর্ণপাত করে না—"হুঁ, স্পষ্ট দেখলুম তুমি নিজের হাতে মাছটাকে বঁড়শীতে গেঁথে দিয়েছ।" তেমনি কেপ্‌লারেরও এরূপ সমালোচনায় বিব্রত হওয়ার কথা ছিল না—যে-গণিত তিনি আবিষ্কার করেছেন তা তাঁর নিজের গণিত-কাঁচের মধ্যে ছিল।

এই বিষয়ের একটা আধুনিক ও অপেক্ষাকৃত কম কাল্পনিক দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। পঞ্চাশ বছর আগে যখন মঙ্গলগ্রহে বার্তাচলাচলের সমস্যা নিয়ে প্রবল আলোচনা চলছিল, তখন এই গ্রহের কল্পিত অধিবাসীদের একথা জানিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল যে পৃথিবীতে চিন্তাশীল জীব রয়েছে ; কিন্তু সমস্যা হল উভয় পক্ষের বোধগম্য ভাষা স্থির করা নিয়ে। এরূপ স্থির করা হল যে শুদ্ধ-গণিতের ভাষাই সব চেয়ে বেশি উপযোগী হবে ; তাই পিথাগোরসের বিখ্যাত উপপাদ্য (famous theorem of Pythagoras) বোঝাবার জন্য সাহারা মরুভূমিতে আগুনের মালা দিয়ে তার ছবি আঁকবার প্রস্তাব করা হল। এই উপপাদ্য হল—কোনো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতর বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গ-

ক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টি তার বৃহত্তম বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমান। মঙ্গলগ্রহের বেশির ভাগ অধিবাসীর কাছেই এই সংকেতের কোনো অর্থ থাকবে না, কিন্তু যুক্তি দেওয়া হল এই যে মঙ্গলগ্রহে যদি কোনো গণিতবেত্তা থাকেন তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন যে এই আলোক-সংকেত পৃথিবীর গণিতবেত্তার কীর্তি। এরূপ উপলব্ধিতে তাঁকে কেউ সমালোচনা করবে না যে তিনি সব কিছুতেই গণিতের সন্ধান পান। খুঁটিনাটির যথাযোগ্য পরিবর্তন করলে (mutatis mutandis), আমার মনে হয় যে এই আলোক-সংকেত ও বাস্তব বহির্জগতের সংকেতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে, যে-গুহায় আমরা বন্দী তারই দেয়ালে এই বাস্তবতা তার ছায়া-সংকেত ফেলেছে। এই ছায়াগুলিকে জীবন্ত অভিনেতার ছায়া বা যন্ত্রের ছায়া ব'লে ব্যাখ্যা করা চলে না। যে-ভাবধারার সঙ্গে গণিতবেত্তার পূর্বপরিচয় ঘটেছে, এই ছায়াগুলিকে তাদেরই প্রতীক ব'লে তিনি চিনে নিতে পারেন।

শুদ্ধ-গণিতের যে-সব প্রত্যয় আমরা বিশ্বরচনায় সহজাত ব'লে দেখি সে-সব যদি, বিশ্বকর্মপদ্ধতি আবিষ্কারে প্রযুক্ত, আমাদের ব্যবহারিক গণিতের প্রত্যয়ের অঙ্গীভূত বা তাদের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাহলে এই ঘটনা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। ব্যবহারিক গণিতের প্রত্যয় মেনেই যদি প্রকৃতির আচরণ হয়ে থাকে, তাহলেও এর থেকে কিছুই প্রমাণ হবে না; প্রকৃতির কর্মধারার সঙ্গে সমতা রক্ষা করার জন্যেই মানুষ স্বেচ্ছায় এ-সব প্রত্যয়ের অবতারণা করেছে। এ-ক্ষেত্রেও আপত্তি উঠতে পারে, আমাদের শুদ্ধ-গণিতও প্রকৃতপক্ষে মনের এমন কোনো সৃষ্টির পরিচয় দেয় না, যে-সৃষ্টি লুপ্ত বা অবচেতন (subconscious) স্মৃতিকে ভিত্তি করে প্রকৃতির কর্মপদ্ধতি উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় পর্যবসিত। তাই যদি হয় তাহলে শুদ্ধ-গণিতের নিয়মাবলী

মেনে প্রকৃতির কাজ চলতে থাকবে, এতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। শুদ্ধ-গণিতবেত্তা যে-সব প্রত্যয় নিয়ে কাজ করেন, তাদের মধ্যে কতকগুলি যে তাঁর প্রকৃতির অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর দৃষ্টান্ত হল, মাত্রা বা পরিমাণবোধ (concept of quantity); কিন্তু এই বোধ এত মৌলিক যে প্রকৃতির কোনো পরিকল্পনা থেকে তাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে এরূপ ভাবাও কঠিন। অন্যান্য প্রত্যয় অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত কিছু গ্রহণ করে—যেমন, বহুমাত্রিক জ্যামিতির উদ্ভব 'দেশের' তিনমাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে। শুদ্ধ-গণিতের অধিকতর জটিল প্রত্যয়গুলি যদি প্রকৃতির কর্মতন্ত্র থেকে গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে তারা অবচেতন মনের অতি গভীর প্রদেশে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। মতভেদ সৃষ্টিকারী এই সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; কিন্তু বাস্তব বিশ্বের কর্মধারার কোনোরূপ চেতন বা অবচেতন অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে, সীমাবদ্ধ বাঁকা-দেশ ও বিস্ফারণশীল দেশের মতো জটিল প্রত্যয় যে শুদ্ধ-গণিতে প্রবেশ করতে পারে একথা বিশ্বাস করা অত্যধিক কঠিন। কোনো ক্ষেত্রেই একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রকৃতি ও আমাদের চেতন গাণিতিক মন (conscious mathematical mind) একই নিয়মাবলী মেনে কাজ করে। খেয়াল ও প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত আমাদের আচরণ বা আমাদের পেশী ও সন্ধির (muscles and joints) আচরণ অনুযায়ী প্রকৃতি তার নিজের আচরণ পরিবর্তন করে না, তার আচরণ নির্ধারিত হয় আমাদের সক্রিয় মনের আচরণ দিয়ে। আমাদের মনের নিয়মাবলী প্রকৃতির উপর আরোপিত হোক বা প্রকৃতি তার নিয়মাবলী আমাদের মনের উপর আরোপ করুক, অবস্থার কোনো ভেদ ঘটে না; বিশ্ব যে গাণিতিক ছাঁচে গড়া এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ এই যুক্তি থেকেই

পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত নরত্ববোধের ভাষায় (anthropomorphic language) আবার বলতে পারি যে বিশ্বপরিকল্পনার মূলে কোনো জীববিজ্ঞানী বা এঞ্জিনিয়র থাকার সম্ভাবনা নেই। মহান বিশ্বশিল্পীর সৃষ্টি এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাঁর আবির্ভাব এক শুদ্ধ-গণিতবেত্তা রূপে।

আমি মনে করি যে এই চিন্তাধারাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দেওয়া যায়, যদিও তা প্রকাশের যথার্থ ভাষা খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ আমাদের পৃথিবীর শব্দসম্পদ, আমাদের পৃথিবীর অভিজ্ঞতা দিয়েই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর শুদ্ধ-গণিতবেত্তা শুদ্ধ-চিন্তাতেই নিমগ্ন, জড়বস্তুর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই। তাঁর সৃষ্টি শুধু চিন্তা থেকেই উদ্ভূত নয়, চিন্তাসম্বলিত ; এঞ্জিনিয়রের সৃষ্টি যেমন এঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে যে-সব প্রত্যয়কে এখন মৌলিক ব'লে স্বীকার করা হয়েছে—যেমন, সসীম 'দেশ' ; শূন্য 'দেশ', যেখানে বিভিন্ন বিন্দুর ভেদ নির্দিষ্ট হয় ঐ সব বিন্দুতে 'দেশের' ধর্মভেদ থেকে ; চতুর্মাত্রিক, সপ্ত বা বহুমাত্রিক 'দেশ' ; চিরবিস্ফারমান 'দেশ' ; ঘটনাবলীর পারম্পর্য, যা কার্যকারণসম্বন্ধ দিয়ে নিয়মিত না হয়ে সম্ভাবনার নিয়মের অধীন বা যে-সব ঘটনার পারম্পর্যের পূর্ণ ও সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় 'দেশ' ও 'কালের' সীমার বাইরে গিয়ে—আমার মনে হয় তারা শুদ্ধ-চিন্তার উপাদান ; যাকে বাস্তব বলা চলে এরূপ কোনো অর্থে এদের উপলব্ধি করা অসম্ভব।

'দেশের' সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে যে-কেউ কিছু লিখেছেন বা বলেছেন তাঁকেই এরূপ মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে 'দেশ সীমাবদ্ধ' এই ধারণা স্বতঃ বিরোধী ও নিরর্থক। 'দেশ' সীমাবদ্ধ হলে সমালোচক বলবেন যে তার সীমা অতিক্রম করে নিশ্চয়ই বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে, আর এই সীমার বাইরে আরো 'দেশ' ছাড়া আর কী থাকতে পারে!—এভাবেই অনন্তে গিয়ে পৌঁছবে (ad infinitum) ; প্রমাণ হল 'দেশ' সীমাবদ্ধ হতে

পারে না। আবার তিনি বলবেন, "দেশ বিস্ফারমান হলে, কিসের মধ্যে এই বিস্ফারণ ঘটবে যদি তার বাইরে আরো 'দেশ' না থাকে?" আবার প্রমাণ হল যা বিস্ফারিত হচ্ছে তা দেশের অংশমাত্র, সমগ্র দেশ বিস্ফারিত হ'তে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর সমালোচকের দল এখনও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে রয়েছেন; তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিশ্বের একটা বাস্তব রূপ আছে। তাঁদের প্রতিজ্ঞা (premises) স্বীকার করে নিলে তাঁদের এই সিদ্ধান্তও মেনে নিতে হবে যে আমরা প্রলাপ বকছি, কারণ তাঁদের যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে না, যে-ভাবেই হোক 'দেশের' সীমাবদ্ধতা তাকে রক্ষা করতে হবে; অর্থাৎ অজ্ঞাতে যে সব প্রতিজ্ঞা সমালোচক অনুমান করেছেন তাদের অস্বীকার করতে হবে। বাস্তবতা দিয়ে বিশ্বকে নির্দেশ করা যায় না; আমার মনে হয় এর কারণ এই যে বিশ্ব শুধু একটা মানস-প্রত্যয়ে (mental concept) গিয়ে ঠেকেছে।

মনে হয় অন্যান্য বিশিষ্ট প্রত্যয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'স্বাতন্ত্র্য-সূত্রের' (Exclusion Principle) কথা বলা যেতে পারে—এই সূত্র 'দেশ' ও কালমাত্রায় এক ধরনের দূর-ক্রিয়ার (action-at-a distance) পরিচায়ক—যেন বিশ্বের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশ, দূরবর্তী অন্যান্য ক্ষুদ্র অংশে কি ঘটছে, তার খবর রাখে। যে-সব নিয়ম মেনে প্রকৃতির কাজ চলছে তারা, যে-নিয়ম মেনে সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত রচনা করেন বা কবি কবিতা রচনা করেন, এদের কথা যতটা মনে করিয়ে দেয়, তার চেয়ে কম মনে করিয়ে দেয় গতিশীল যন্ত্রের নিয়মাবলীর কথা; অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মাবলীর সঙ্গে, সঙ্গীত ও কবিতা রচনার নিয়মাবলীর ঘনিষ্ঠতা বেশি। 'কটিলিয়ন্' (Cotillion—এক ধরনের

নাচ) নৃত্যে, নৃত্যশিল্পীদের গতির সঙ্গে ইলেকট্রন ও পরমাণুর গতির যতটা সাদৃশ্য আছে, তার চেয়ে কম সাদৃশ্য রয়েছে চলন্ত ট্রেনের বিভিন্ন অংশের গতির সঙ্গে। বস্তুর মূল প্রকৃতি যদি চিরঅজ্ঞেয় হয়ে থাকে তাহলে এই নৃত্য, বাস্তবজীবনে 'বল' (ball) সম্মেলনে বা সিনেমার পর্দা বা 'বোকাসিও'র (Boccaccio) গল্প যেখানেই প্রদর্শন করা হোক না কেন, কিছু এসে যাবে না। বিশ্ব খাঁটি চিন্তা দিয়ে গঠিত, এই হল তার সব চেয়ে ভালো রূপকল্পনা, যদিও এই বিশ্ব-ছবি খুবই অসম্পূর্ণ। ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের অভাবে, এই চিন্তাকে বলতে হবে 'গণিতবেত্তার চিন্তা'।

দেখা যাচ্ছে মন ও বস্তুর (mind and matter) পরস্পর সম্বন্ধের সমস্যার মূলে গিয়ে আমরা পৌঁছেচি। পরমাণবিক বিক্ষোভের ফলেই দূরবর্তী সূর্য আলোক ও উত্তাপ ছড়িয়ে দেয়। ঈথরের মধ্য দিয়ে আটমিনিট কাল চলার পর এই বিকিরণের খানিকটা এসে আঘাত করে আমাদের চোখের পর্দায়, সঙ্গে সঙ্গে অক্ষিপট (retina) সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, দৃক্স্নায়ুকে (optic-nerve) বাহন করে এই সংক্ষোভ মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছয়। এখানে 'মন' তাকে একটা 'বোধ' রূপে (sensation) উপলব্ধি করে ; এই উপলব্ধির বেগই আমাদের চিন্তা-শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, ফল দাঁড়ায় (মনে করা যাক) সূর্যাস্তের কবি-কল্পনা। এই প্রক্রিয়ার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা রয়েছে, A, B, C, D··· X, Y, Z—সক্রিয় মন 'B', মস্তিষ্ক 'C', দৃক্স্নায়ু 'D' এদের ভিতর দিয়ে কবির চিন্তাধারা 'A', পরমাণবিক বিক্ষোভ 'Z'-এর সঙ্গে যুক্ত। দূরবর্তী বিক্ষোভ 'Z' থেকে, চিন্তা 'A'-এর উদ্ভব, যেমন ঘণ্টা-সংলগ্ন দূরবর্তী তারের প্রান্তদেশ টানলে ঘণ্টা বেজে ওঠে। আগাগোড়াই একটা নিরবচ্ছিন্ন বস্তুসংযোগ রয়েছে ব'লে একটা বস্তুগঠিত তারের

টানে কি করে একটা বস্তুগঠিত ঘণ্টা বেজে ওঠে, তা বোঝা সহজ। কিন্তু বাস্তব পরমাণুর বিক্ষোভ কেমন করে কবির চিন্তাধারার উদ্রেক করতে পারে তা ধারণা করা তত সহজ নয়, কারণ এদের মূলপ্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

শুধু এই জন্যেই ডেকার্টে একথা জোর করে বলেছেন যে বস্তু ও মনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকা সম্ভব নয়। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে প্রকৃতিগত বৈষম্যে এরা (বস্তু ও মন) দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় সত্তা; বস্তুর মূলধর্ম চিন্তা। তাই এ-ধরণা তাঁর বদ্ধমূল হয়েছিল যে 'মন' ও 'বস্তুর' দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ; যেন দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সমান্তরাল পথে তারা চলেছে, কখনও মিলনের সম্ভাবনা নেই।

বার্কলে (Berkeley) ও ভাবদার্শনিকের দল (idealist-philosophers) ডেকার্টের একথা স্বীকার করেছিলেন যে মন ও বস্তুর মূল প্রকৃতি পৃথক হলে কখনও তাদের পরস্পর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে না। কিন্তু তাঁরা জোর করে বললেন যে এদের পরস্পরের মধ্যে একটা সক্রিয়তা বর্তমান, তাই বস্তু ও মনের প্রকৃতিগত কোনো ভেদ নেই; ডেকার্টের ভাষা পরিবর্তন করে বলতে হয় "বস্তুর মূলধর্ম ব্যাপ্তি নয়, চিন্তা।" বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলে তাঁদের যুক্তি এই দাঁড়ায়—কার্য ও কারণের মূল প্রকৃতি অভেদ; পূর্বোক্ত ধারায় 'A' যদি 'B' থেকে উদ্ভূত হয় তাহলে 'B' ও 'A'-র মূল প্রকৃতিতে কোনো ভেদ থাকবে না, 'C' ও 'B'-র প্রকৃতি হবে অভেদ, ইত্যাদি। তাই 'Z' ও 'A'-র প্রকৃতিগত কোনো বৈষম্য থাকবে না। যে-সব বিভিন্ন সূত্র এই ধারাকে নিরবচ্ছিন্ন করেছে, তাদের মধ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানসীমার অন্তর্গত হল 'A' ও 'B', আমাদের চিন্তা ও বোধশক্তি। দূরবর্তী সূত্র X, Y, Z, এদের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি জানতে পারি শুধু অনুমানের সাহায্যে, আমাদের বোধশক্তির ভিতর

দিয়ে যে-ক্রিয়া এরা আমাদের মনে পৌছে দেয় তারই সাহায্যে। অজ্ঞাত দূরবর্তী সূত্রাবলী X, Y, Z ও পরিচিত নিকটবর্তী সূত্র 'A', ও 'B', এদের মূল প্রকৃতিতে কোনো ভেদ নেই একথা মেনে নিয়ে বার্কলে এই যুক্তি প্রয়োগ করলেন যে এই সূত্রগুলি সবই 'চিন্তা' বা 'ভাব' জাতীয় (of the nature of thoughts or ideas) ; কারণ 'ভাব' ছাড়া 'ভাবের মতো' কোনো কিছু নেই (there is nothing like an idea except an idea)। মন ছাড়া আর কোথাও চিন্তা বা ভাবের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কোনো বস্তু সম্বন্ধে যখনই 'আমরা' সচেতন হই তখনই তার অস্তিত্ব থাকে 'আমাদের' মনে ; কিন্তু বস্তু 'আমাদের' চেতনা বোধে না থাকলে, তার অস্তিত্ব আছে, একথা 'আমরা' বলতে পারি না। মানুষের সন্ধান পাওয়ার বহুপূর্বেই প্লুটোগ্রহের (Planet Pluto) অস্তিত্ব ছিল, আমাদের দৃষ্টিবোধে ধরা পড়ার অনেক আগে থেকেই এই গ্রহ ক্যামেরার যন্ত্রদৃষ্টিতে ধরা পড়ে ফোটোগ্রাফের প্লেটে তার অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছিল। এ-সব যুক্তি থেকেই বার্কলে 'এক চিন্ময় অনন্ত সত্তার' (Eternal Being) অস্তিত্ব কল্পনা করেন ; এই 'সত্তার' মনেই সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব। এক অতীত যুগের শব্দসম্পদে মধুর ও গম্ভীর ভাষায় তিনি তাঁর দর্শনের মূল তথ্য লিপিবদ্ধ করেন :

"স্বর্গের সম্মিলিত সঙ্গীত প্রবাহ ও পৃথিবীর বস্তুসম্পদ—এক কথায়, এই বিরাট বিশ্বরচনার মূল বস্তুসম্ভার—এদের কোনো সত্তা নেই, যদি বিশ্বে 'মন' ব'লে কিছু না থাকে……যদি এরা আমার বোধ শক্তিতে ধরা না দেয়, বা আমার বা অন্য কোনো লোকাতীত প্রাণীর মনে স্থান না পায়, তাহলে বলব এদের কোনো অস্তিত্ব নেই, আর তা না হলে কোনো 'অনন্ত চিন্ময় সত্তার মনে' এরা অধিষ্ঠিত।"

আমার মনে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে অনেকটা অনুরূপ

সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেচে। পূর্বোক্ত ধারার গোড়ার সূত্র A, B, C, D, এদের পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করে জীববিদ্যা এই সিদ্ধান্তের দিকেই চলেছে ব'লে মনে হয় যে এই সূত্রগুলির সাধারণ প্রকৃতিতে কোনো ভেদ নেই। সময় সময় একথাই এক বিশেষভাবে বলা হয়—জীবতত্ত্ববিদ C, D-কে যান্ত্রিক ও বস্তুগত ব'লে মনে করেন ব'লেই A, B-কেও যান্ত্রিক ও বস্তুগত হতে হবে; কিন্তু এরূপ দাবীও উত্থাপন করা যেতে পারে, যেহেতু A, B মনোগত—C, D-ও মনোগত হতে বাধ্য। C, D-কে বাদ দিয়ে, প্রাকৃতবিজ্ঞান সোজা চলে গেছে এই ধারার দূরতম প্রান্তে; তার কাজ হল X, Y, Z-এর ক্রিয়া পদ্ধতি নির্ণয় করা। আমার মনে হয় প্রাকৃতবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ একথা বলে—বিশ্বলোক বা পরমাণুর অন্তর্লোক যেখানেই প্রবেশ করি না কেন, এই ধারার প্রান্তস্থ সূত্রগুলির মূলপ্রকৃতি A, B-র মতো, অর্থাৎ 'শুদ্ধ-চিন্তা' জাতীয়। বার্কলের সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছনো গেল, কিন্তু বিপরীত প্রান্ত থেকে। তাই বার্কলের তিনটি বিকল্পের (alternatives) শেষটি এসেছে প্রথমে, বাকি দুটি তুলনায় অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়। "আমার বা অন্য কোনো সৃষ্ট প্রাণীর মনে" বস্তুর অস্তিত্ব আছে কি নেই, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়; এক "চিন্ময় অনন্ত সত্তার মনে" তাদের অধিষ্ঠান, এর থেকেই তাদের বাস্তবতার উদ্ভব।

মনে হতে পারে, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে আমরা এক নির্মম আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করে চলেছি। আমার মতে, কথাটা অবস্থার সম্যক পরিচয় দেয় না। বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি যদি সত্যিই আমাদের জ্ঞানসীমার বহির্ভূত হয় তাহলে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আদর্শবাদের বিভাগ-রেখা অত্যধিক অস্পষ্ট হয়ে ওঠে; যে-যুগে বাস্তবতাকে যন্ত্র ব'লে স্বীকার করা হত তারই স্মৃতিচিহ্ন ব'লে একে মনে হয়। বাস্তবসত্তার অস্তিত্ব আছে, কারণ

কতকগুলি বস্তু তোমার ও আমার চেতনার উপর অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু পূর্বাহ্নেই তাদের 'বাস্তব' বা 'আদর্শ' ব'লে মার্কা দিয়ে রাখলে এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোনো অধিকার থাকে না। আমি বলি এদের আসল মার্কা হল 'গাণিতিক'; অবশ্য এর সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে যে এই শব্দের ব্যাখ্যার অন্তর্ভূক্ত হল সমগ্র 'শুদ্ধ-চিন্তা,' কেবলমাত্র পেশাদার গণিতবেত্তার অধীত বিদ্যা নয়। এই মার্কা, বস্তুর চরম প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই নির্দেশ করে না, তার আচরণের কিছু আভাস দেয় মাত্র। এই নির্বাচিত মার্কা অবশ্য জড়বস্তুকে মায়া বা স্বপ্নের পর্যায়ে নির্বাসিত করে না। বস্তুধর্মী বিশ্ব পূর্বের মতো বাস্তবই থেকে যায়; মনে হয়, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক চিন্তাধারার নানাবিধ পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও এই কথার যাথার্থ্য কখনও ক্ষুণ্ণ হবে না। কারণ বাস্তবতা হল একটা 'মানস প্রত্যয়' (mental concept) মাত্র, আমাদের স্পর্শবোধের উপর বস্তুর প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার পরিমাপক। পাথরের টুকরো বা মোটর গাড়িকে আমরা বাস্তব আখ্যা দিয়ে থাকি, প্রতিধ্বনি বা রামধনুকে তা বলি না। এ হল বাস্তবশব্দের সাধারণ সংজ্ঞা; পাথর বা গাড়ি কোনো উপায়ে অবাস্তব বা কম বাস্তব হতে পারে একথা সংজ্ঞাবিরোধী ও নিরর্থক, কারণ বর্তমানে তাদের আমরা কঠিন বস্তুকণা ব'লে না ভেবে গাণিতিক সূত্র ও চিন্তা বা 'শূন্যদেশের' আবর্তের সঙ্গে যুক্ত করছি। শোনা যায় ডক্টর জনসন (Dr. Johnson) নাকি একটা পাথরে লাথি মেরে বার্কলের দর্শন সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, "এ হতেই পারে না, এই আমি একে মিথ্যে ব'লে প্রমাণ করলাম।" যে দার্শনিক সমস্যার সমাধান করেছে ব'লে এই ক্ষুদ্র পরীক্ষা দাবী করছে, আসলে সেই সমস্যার সঙ্গে এর কোনো যোগই নেই; বস্তুর বাস্তবতাকেই শুধু ফিরে প্রমাণ করল। যতই উন্নতির পথে বিজ্ঞান অগ্রসর হোক না কেন,

পাথর চিরদিন স্থূল বস্তু হয়েই থাকবে, কারণ বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পাথর ও এই জাতীয় বস্তুই 'মান' হিসেবে ধরা হয়।

পাথরে লাথি না মেরে একটি টুপি, যার মধ্যে কোনো ছেলে লুকিয়ে একখানা ইঁট রেখে দিয়েছে, তার উপর লাথি মারলে, অভিধান প্রণেতা জনসন হয়তো বার্কলের দর্শন ব্যর্থ করে দিতে পারতেন; কারণ বহির্বাস্তবতা প্রমাণ করতে 'বিস্ময়বোধ'ই (surprise) যথেষ্ট, দ্বিতীয় প্রমাণ হল "পরিবর্তনের সঙ্গে নিত্যতা (permanence with change) —তোমার স্মৃতিতে নিত্য, বাইরে পরিবর্তনীয়।" এতে এই ভুল ভাঙল "সব কিছুই আমার মনের সৃষ্টি, অন্য কোনো মনে তার অস্তিত্ব নেই," কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন কোনো কিছু করা কঠিন যা একে ব্যর্থ করে দেয় না। 'বিস্ময়' ও নূতন জ্ঞান থেকে যে-যুক্তির উদ্ভব হয়েছে তা এক 'সর্বগত মনের' ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অক্ষম; তোমার মন ও আমার মন, যে-মন বিস্ময় সৃষ্টি করে ও যে-মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় উভয়েই এই সর্বগত মনের উপাদান-একক (units) বা অতিরিক্ত অংশও হতে পারে। সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে যে-বিচিত্র চিন্তাস্রোত বয়ে চলেছে প্রত্যেকটি পৃথক মস্তিস্ক-কোষের (brain cell) সঙ্গে তাদের সকলের পরিচয় ঘটতে পারে না।

বাস্তবতা পরিমাপের কোনো 'পরম বহির্মান' (absolute extraneous standard) না থাকলেও একথা বলার বাধা নেই যে দুটি জিনিসের বাস্তবতার মাত্রা সমান বা বিভিন্ন। স্বপ্নের ঘোরে কোনো পাথরে লাথি মারলে হয়তো পায়ে একটু ব্যথা নিয়ে জেগে উঠে দেখব যে স্বপ্নে-দেখা পাথর শুধু আমারই মনের একটা সৃষ্টিক্রিয়া মাত্র, যার প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে পায়ের মধ্যে জেগে উঠেছে একটা স্নায়বিক-আবেগ (nerve-impulse)। ভ্রম বা স্বপ্ন-লব্ধ জিনিসের প্রতীক ব'লে এই পাথরকে মনে করা যেতে

পারে ; জনসন যে-পাথরে লাথি মেরেছিলেন তার তুলনায় এই স্বপ্ন-লব্ধ পাথর 'কম বাস্তব'। তাই সর্বগত মনের সৃষ্টির তুলনায় পৃথক মনের সৃষ্টিকে 'কম বাস্তব' বলা যেতে পারে। আমাদের স্বপ্নে-দেখা 'দেশ' ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 'দেশ,' এদের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য করতে হবে ; এই শেষোক্ত 'দেশ,' যা আমাদের সকলের কাছে একেবারে অভেদ, সেই হল সর্বগত মনের 'দেশ'। 'কাল' সম্বন্ধেও একথা খাটে ; এই 'কাল' সর্বগত মনের 'কাল' ব'লে, আমাদের সকলের কাছে সমান, এক একটানা গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। আবার ঘটনা নিয়ন্ত্রণকারী ঘটনাবলী, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মাবলী, এদের এক সর্বগত মনের চিন্তার নিয়মাবলী (laws of thought) ব'লে ভাবতে পারি। প্রকৃতির সমতা এই মনের আত্ম-সঙ্গতির (self-consistency) সাক্ষ্য দেয়।

'বিশ্ব শুদ্ধ-চিন্তার জগৎ,' এই ধারণা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রেই নূতন আলোকসম্পাত করেছে। এখন বুঝতে পারি, যে-ঈথরে বিশ্বের সমগ্র ঘটনাবলী সংঘটিত হয় তা কেমন করে এক গাণিতিক অবাস্তবতায় পর্যবসিত হতে পারে ; অক্ষরেখা ও দেশান্তর রেখার মতোই তা সমমাত্রায় অবাস্তব ও গাণিতিক। আবার এও এখন বোঝা যাচ্ছে, যে-তেজ বিশ্বের মূল সত্তা তাকে কেন এক 'গাণিতিক অবাস্তবতা' ব'লে মনে করতে হবে—এক ব্যাসসমীকরণের (differential equation) সমাসকলন পদ্ধতির ধ্রুবরাশি ব'লে (constant of integration)।

এই ধারণা থেকে বুঝতে পারি যে কোনো ঘটনার গাণিতিক ব্যাখ্যাই তার চরম সত্য নির্ধারণ করবে। এই ব্যাখ্যায় কোনো ত্রুটি না থাকলে এই ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হবে সুসম্পূর্ণ। ভুলের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে তবে গাণিতিক সূত্রের বাইরে যাওয়া চলে ; ঘটনার প্রকৃতি নির্ণয়ে কোনো প্রতিকৃতি বা ছবি হয়তো বোঝার পক্ষে খানিকটা

সাহায্য 'করতে পারে'; কিন্তু সাহায্য 'করবেই' এরূপ আশা করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই, আর এরূপ ছবি বা প্রতিকৃতি খুঁজে না পেলে এই ব্যর্থতায় প্রমাণ হবে না যে আমাদের যুক্তি বা জ্ঞানে কোনো ত্রুটি রয়েছে। গাণিতিক সূত্রাবলী ও তাদের সাহায্যে বর্ণিত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় প্রতিকৃতি বা ছবির অবতারণা করলে, তা বাস্তবতার দিকে আমাদের এগিয়ে না দিয়ে বরং এক ধাপ পিছিয়ে দেয়; এ-যেন কোনো অশরীরী প্রাণীর মূর্তি গড়ার মতো। দূত, ঘোষক (herald) সঙ্গীতজ্ঞ, চোর ইত্যাদির ভূমিকায় দেবতা হার্মিসের (Hermes) খোদাই-করা বিভিন্ন মূর্তিগুলি দেখতে একরকম হবে ব'লে আশা করা যেমন যুক্তিসঙ্গত হবে না, এই বিভিন্ন প্রতিকৃতি বা ছবির মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি আশা করাও ঠিক তেমনি অযৌক্তিক হবে। কেউ কেউ বলেন হার্মিস হলেন 'বায়ুদেবতা'; যদি তাই হয় তাহলে তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্য জড়িয়ে থাকবে তাঁর গাণিতিক বর্ণনায়—এই বর্ণনা এক সংকোচনশীল বায়বের (compressible fluid) গতির সমকরণের (equation of motion) চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। বার্তাবহন ও ঘোষণা, সঙ্গীতের স্বরসৃষ্টি, খাতাপত্র উড়িয়ে নেওয়া এ-সব কাজ এই সমীকরণের যে-সব বৈশিষ্ট্য থেকে সূচিত হয়, তাদের কি করে বেছে নিতে হবে তা গণিতবেত্তা জানেন। এ-সব বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দিতে হার্মিসের কোনো মূর্তি তাঁর দরকার হবে না; কিন্তু মূর্তির উপরেই যদি তাঁকে নির্ভর করতে হয়, তাহলে সম্পূর্ণ একসারি বিভিন্ন মূর্তি ছাড়া তাঁর চলবে না। কোনো কোনো গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী, তরঙ্গ-বলবিদ্যার প্রত্যয়গুলির মূর্তি গড়তে এখনও ব্যাপৃত।

সংক্ষেপে, 'বস্তু কি' গাণিতিক সূত্র কখনও তা বলতে পারে না, তার আচরণ কি রকম হবে একথাই শুধু সে বলতে পারে; বস্তুর বৈশিষ্ট্য দিয়েই

এই সূত্র তাকে নির্দেশ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে-কোনো বৃহৎ বস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলির 'একেবারে মিলে যাওয়া' সম্ভব নয়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বহু জটিলতা ও আপাত অসঙ্গতির হাত থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের রক্ষা করেছে। আলোর উপাদান বস্তুকণা, না তরঙ্গ, এখন আর তা আলোচনা করার দরকার হয় না ; নিখুঁতভাবে তার আচরণ নির্দেশ করতে পারে এরূপ কোনো গাণিতিক সূত্রের সন্ধান পেলেই আলোর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কিছুই জানা হয়ে যায়, ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারেই তাকে বস্তুকণা বা তরঙ্গ ব'লে ভাবতে পারি। যে-সব দিনে আলোকে তরঙ্গ ব'লে ভাবব, ইচ্ছে করলে তার পরিচলনের জন্যে এক ঈথরের কল্পনা করে নিতে পারি ; কিন্তু দিনের পর দিন এই ঈথরের পরিবর্তন হতে থাকবে ; আমাদের গতিবেগ পরিবর্তনের সঙ্গে কি ভাবে ঈথরের পরিবর্তন হবে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। আবার, ইলেকট্রন-তরঙ্গের অস্তিত্ব ত্রিমাত্রিক বা বহুমাত্রিক 'দেশে', বা তার কোনো অস্তিত্ব নেই, এ-সব কথা এখন আর আলোচনা করার দরকার নেই। ইলেকট্রনের অস্তিত্ব এক গাণিতিক সূত্রে, এই সূত্র ছাড়া আর কিছুই এর চরম বাস্তবতা নির্দেশ করতে পারে না ; আমাদের খুশিমতো একে তিন, ছয় বা বহু মাত্রার তরঙ্গ ব'লে কল্পনা করে নিতে পারি। মোটেই তরঙ্গধর্মী নয় ব'লেও এদের ব্যাখ্যা করা যায়, এতে হাইসেনবার্গ ও ডিরাকের পন্থা অনুসরণ করতে হবে। এর সব চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হল একে এমন এক 'দেশমাত্রায়' তরঙ্গ ব'লে ভাবা, যেখানে প্রতি ইলেকট্রনের জন্য তিনমাত্রার ব্যবস্থা রয়েছে ; যেমন বস্তুসম্বলিত বৃহৎ বিশ্বের সব চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হল তিন মাত্রায় তার বস্তুসংঘের বিন্যাস কল্পনা করা, আর তার ঘটনাবলীকে চারমাত্রায় বিন্যস্ত ঘটনাবলী

ব'লে ভাবা। কিন্তু এ-সব ব্যাখ্যার কোনোটিরই কোনো স্বতন্ত্র বা পরম মূল্য নেই।

এই মত অনুসারে, দেশ-কাল নামধারী শূন্য বুদবুদের সঙ্গে আমাদের চেতনার পরিবর্তনশীল সংস্পর্শের প্রকৃতিতে রহস্যের সন্ধান করি না; কারণ এই সংস্পর্শ, মনের সঙ্গে মনের এক সৃষ্টির সংস্পর্শেই পরিণত হয়—অনেকটা বই পড়া বা গান শোনার মতো। বলা বাহুল্য, বস্তু সম্বন্ধে এই মত মেনে নিলে, বিশ্বের আপাত বিপুলতা ও শূন্যতা, আর তার মধ্যে আমাদের আয়তনের অতিক্ষুদ্রতায় উদ্বেগ বা বিমূঢ়তার কোনো কারণ নেই। চিন্তায় যে-সব বৃহদায়তন জিনিসের সৃষ্টি করি বা অন্যে যে-সব কল্পনা ও বর্ণনা করে, তাদের বিশালতায় তো আমরা ভয় পাই না। ডু মরিয়রের (Du Maurier) গল্পে, পিটর ইব্বেটসন্ (Peter Ibbetson) ও ডাচেস্ অফ টাওয়ারস্ (Duchess of Towers) ক্রমবর্ধমান ও বিপুলায়তন স্বপ্ন-পুরী ও স্বপ্ন-উদ্যান গড়ে চলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মানসসৃষ্টির আয়তন দেখে এতটুকু শঙ্কিত হননি। বিশ্বের বিপুলতা ভয়ের কারণ না হয়ে সন্তুষ্টির কারণ হয়েছে; কারণ আমরা কোনো ছোট রাজ্যের অধিবাসী নই। " 'দেশ' সসীম," একথা ভেবেও হতবুদ্ধি হওয়ার কারণ নেই; যে-পরিসীমা দিয়ে স্বপ্নে আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তার বাইরে কী রয়েছে তা জানবার কৌতূহল আমাদের হয় না।

'কাল' সম্বন্ধেও একথা খাটে; 'দেশের' মতো 'কাল'কেও ভাবতে হয় সীমাবদ্ধ। কালস্রোত বেয়ে পেছন দিকে চললে, দীর্ঘযাত্রার ফলে আমরা যে তার একান্ত আদিতে গিয়ে নিশ্চিত পৌঁছব এ-তথ্যের অনেক নিদর্শন মেলে; সে এমন একটা কালমাত্রা যার পূর্বে বিশ্বের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। চিরগতিশীল যন্ত্রের সৃষ্টি প্রয়াসে প্রকৃতি বাধা দেয়,

তাই একথা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়—যে প্রক্রিয়ার প্রতি প্রকৃতির এত বিমুখতা তার বিপুলমাত্রার দৃষ্টান্ত রয়ে যাবে তারই অন্তর্গত বিশ্বে। প্রকৃতির বিস্তৃত আলোচনা একথা সমর্থন করে। তাপ-গতি-বিজ্ঞান (science of thermodynamics) থেকে জানা গেছে কি করে 'এন্ট্রপি' বা 'তাপ-দান-বিমুখতা' (entropy) বৃদ্ধি-প্রক্রিয়াতে প্রকৃতির সব কিছুই তার চরম অবস্থায় গিয়ে পৌছয়। 'এন্ট্রপি' চিরদিন বেড়েই চলবে, বাড়তে বাড়তে যখন তার বৃদ্ধি থেমে যাবে, তখন স্থিতি লাভ করবে। এই অবস্থায় পৌছলে, প্রগতি হবে অসম্ভব, বিশ্বের ঘটবে মৃত্যু। বিজ্ঞানের এই শাখার সব কিছুই ভুল ব'লে প্রতিপন্ন না হলে, একথা বলতে পারি যে প্রকৃতিতে শুধু দুটিমাত্র বিকল্প রয়েছে—প্রগতি ও মৃত্যু ; একমাত্র নিশ্চলতা আসবে তার সমাধির প্রশান্তিতে।

সংখ্যায় বেশি না হলেও অন্তত কয়েকজন বিজ্ঞানী এই শেষোক্ত মত সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করবেন। বর্তমান নক্ষত্রের দল বিকিরণের অত্যধিক অপচয়ে ক্রমাগত ক্ষয়ের পথে চলেছে, একথা অস্বীকার না করলেও তাঁরা বলেন যে বিশ্বলোকের গভীরতম গহনে কোথাও হয়তো আবার এই বিকিরণের পুনর্ব্যবস্থায় বস্তুস্থষ্টির কাজ চলেছে ; এক নূতন স্বর্গ ও নূতন গ্রহলোক রচনার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, পুরানো বিশ্বের ভস্মাবশেষ থেকে নয়, তার দহনে মুক্ত বিকিরণ থেকে। তাঁরা এক চক্রাবর্ত-বিশ্বের (cyclic universe) পক্ষপাতী ; একস্থানে এর খণ্ড-প্রলয় ঘটলে, সেই প্রলয়ে মুক্ত বস্তু ও বিকিরণ অন্যত্র আবার এক সৃষ্টি গড়ে তোলে।

সুপ্রতিষ্ঠিত তাপ-গতিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মের সঙ্গে এই চক্রাবর্ত বিশ্বের ধারণার পূর্ণবিরোধ রয়েছে ; এই নিয়ম বলে—'এন্ট্রপি' ক্রমাগত বেড়েই চলবে, আর যে-কারণে ও যে-উপায়ে চিরগতিশীল যন্ত্রের উদ্ভব

অসম্ভব ঠিক তার জন্যই চক্রাবর্ত-বিশ্বের ধারণাও অসম্ভব। এরূপ মনে করা খুব অসঙ্গত নয় যে আমাদের জ্ঞানসীমার বাইরে জ্যোতির্লোকে যে-সব অবস্থা বর্তমান তাতে এই নিয়ম নাও খাটতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞান-সাধক তা অসম্ভব ব'লেই মনে করেন। চক্রাবর্ত-বিশ্ব ও তাপ-গতিবিদ্যার মধ্যে প্রথমটি যে অধিকতর জনপ্রিয় একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিজের ব্যক্তিত্ব-অবসানের চিন্তার মতোই, অধিকাংশ ব্যক্তি এই বিশ্ব অবসানের চিন্তাকে তিক্ত ব'লে মনে করেন; আত্ম-অমরতা (Personal immortality) প্রতিষ্ঠায় মানুষের যে সহজাত প্রয়াস তার প্রতিক্রিয়া ঘটে অবিনশ্বর বিশ্বের স্বাভাবিকতা নাশের প্রচেষ্টার উপর।

দৃঢ় বৈজ্ঞানিক মত হল বিশ্বের 'এনট্রপি' ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে চরম বৃদ্ধিমাত্রায় গিয়ে পৌছবে। এখনও 'এনট্রপি' সেই বৃদ্ধির শিখরে পৌছয়নি, পৌছলেও তার কথা না ভাবাই ভালো। এখনও তার দ্রুতবৃদ্ধি চলছে, তাই বলতে পারি তার একটা 'আরম্ভ-কাল' (beginning) ছিল; অনতিদূরবর্তী কালমাত্রায় নিশ্চিত এক 'সৃষ্টি' (creation) ঘটে গেছে।

বিশ্ব যদি চিন্তার বিশ্ব হয়ে থাকে, তাহলে তার সৃষ্টি চিন্তারই একটি ক্রিয়া মাত্র। 'দেশ-কালের' সীমাবদ্ধতা সৃষ্টিকে চিন্তার এক ক্রিয়ারূপে কল্পনা করতে প্রায় বাধ্য করেছে। বিশ্বগোলকের ব্যাসার্ধ ও তার অন্তর্ভূত ইলেকট্রনের সংখ্যা, এই দুটি ধ্রুবরাশির মাত্রা নির্ণয়ে চিন্তার প্রয়োগ করতে হয়; এই চিন্তার ঐশ্বর্য নির্ধারিত হয় রাশিগুলির বিপুলতা দিয়ে। যে 'দেশ' ও 'কাল' চিন্তার ভূমিকা, তাদের উদ্ভব এই ক্রিয়ারই অংশ রূপে। আদি বিশ্ব-সংস্থিতিতে (primitive cosmologies) এক স্রষ্টার অবতারণা করা হয়েছিল, তাঁর ক্রিয়া 'দেশ' ও 'কালে'

পরিব্যাপ্ত, কাঁচামাল গড়ে-পিটে তিনিই রূপ দিয়েছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রদলের। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে এরূপ কল্পনা করতে বাধ্য হই, শিল্পী যেমন থাকেন তাঁর ছবির বাইরে তেমনি স্রষ্টার কাজ চলছে 'দেশ' ও 'কালের' বাইরে, এরা তাঁর সৃষ্টির অংশ বিশেষ। অগাস্টিনের (Augustine) মতের সঙ্গে এর মিল আছে—("Non in tempore, sed cum tempore, finxit Deus mundum")। বস্তুতঃ এই মত প্লেটোর সময়কালীন—

" 'কাল' ও স্বর্গের সৃষ্টি হয়েছে একই মুহূর্তে, যাতে তাদের কখনও অবসান ঘটলে যেন একই সঙ্গে ঘটতে পারে। 'কালের' সৃষ্টিক্রিয়ায় এই ছিল বিশ্বস্রষ্টার মন ও চিন্তা।"

'কালের' সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত কম যে, সমগ্র 'কালকে' সৃষ্টি-ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা কর্তব্য ; এই সৃষ্টি-ক্রিয়া হল চিন্তার অভিব্যক্তি, তার রূপ-প্রকাশ।

প্রাকৃত জগতের বর্তমান গাণিতিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও চরম ব'লে প্রমাণিত হবে, এই অনুমানের উপর আমাদের সমস্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠিত ব'লে আপত্তি উঠতে পারে। পূর্বোক্ত রূপক সম্বন্ধে একথা বলা যেতে পারে যে, বাস্তবতাকে দাবাখেলা ব'লে বর্ণনা করা একটা নিছক কল্পনা মাত্র ; অন্য কল্পনাও ছায়ার গতির অনুরূপ বর্ণনা দিতে পারে। এর জবাব এই—আজ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, অন্যান্য কল্পনা এত বিশদভাবে এত সহজ-ভাবে ও এত পর্যাপ্তরূপে এই ঘটনাবলীর বর্ণনা করতে পারেনি। দাবা-খেলায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো বলবেন : "এক টুকরো শাদা কাঠ, কুঁদে যার উপরের অংশ ঘোড়ার মাথার মতো করা হয়েছে, তাকে নিচেকার সারির বর্গক্ষেত্রাকার ঘরের দক্ষিণ কোণের একঘর বাঁদিকে বসিয়ে সরিয়ে আনা হল...." দাবাখেলোয়াড় বলবেন, "শাদা Kt থেকে KB3।" তাঁর এই

কথা ঘোড়ার 'চালের' সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হয় না, তাকে এক বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে, সব চেয়ে সহজ ব্যাখ্যাই সরলতার অনুপাতে তার প্রতিষ্ঠার মাত্রা দাবী করতে পারে। নিছক সরলতা ছাড়াও তার আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে; যথার্থ ব্যাখ্যা ব'লে স্বীকৃত হবার তার সব চেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। গাণিতিক ব্যাখ্যা চরম বা সহজতম ব'লে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে, একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিলেও নিঃসংকোচে বলা যায় যে এ-পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে এই ব্যাখ্যাই সব চেয়ে সহজ ও সম্পূর্ণ; কাজেই আমাদের বর্তমান জ্ঞানমাত্রার অনুপাতে এই ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যার নিকটতম ব'লে পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি।

কেউ কেউ হয়তো একথা স্বীকার করবেন না, তাঁদের যুক্তি হল এই—মনে হচ্ছে প্রকৃতির বর্তমান গাণিতিক ব্যাখ্যা এক অনাগত নূতন যান্ত্রিক ব্যাখ্যার সঙ্গে বিরোধ মেটাতে অর্ধেক পথ এগিয়ে আছে। মনে হয়, যান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের আধুনিক মনের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। আংশিক ভাবে এর মূলে রয়েছে হয়তো আমাদের প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার ভূমিকা; বাকি অংশ হয়তো, দৈনন্দিন জীবনে বস্তু-পদার্থের যান্ত্রিক আচরণ দেখা। তাই যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকেই আমাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয় ও সহজেই তা বোধগম্য হয়। কিন্তু অবস্থার একটা পূর্ণ বাস্তব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বলবিদ্যা তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রতিভা নিঃশেষে প্রয়োগ করেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে; বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ক্ষেত্রেই তার অকৃতার্থতার গ্লানি পরিস্ফুট। গণিতের স্থান যদি অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করার দিনই আসে, তাহলে পদপ্রার্থী হিসেবে বলবিদ্যার নির্বাচিত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত।

একথা অনেক সময়ই ভুলে যাই যে এ-সব সমস্যার আলোচনা কেবলমাত্র সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। "বিজ্ঞানীর মতের কোনো স্থিরতা নেই, তাই তাঁর কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করাই ভালো"—এরূপ তিরস্কার বিজ্ঞানীমাত্রেরই প্রায় গা-সহা হয়ে গেছে। জ্ঞান-নদীর (River of Knowledge) পরিসন্ধানে কখনও কখনও তার মূল প্রবাহ ত্যাগ করে বিজ্ঞানীকে পিছিয়ে আসতে হয় তার পশ্চাতে অবস্থিত স্রোতহীন স্তব্ধ জলাশয়ে; জলাশয়ে প্রবেশ না করে কোনো পরিসন্ধানীই তার প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন না। যা বিশেষ গুরুতর ও যা তাঁর আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে, সে হল এই জ্ঞান-নদীর আঁকাবাঁকা স্রোতধারা, কখনও পুবে কখনও বা পশ্চিমে প্রবাহিত। কখনো পরিসন্ধানী ব'লে ওঠেন—"যেহেতু আমি স্রোতের অনুকূলে পশ্চিম দিকে চলেছি, আমার মনে হয় যে-মহাসাগর বাস্তবতার প্রতীক তা পশ্চিম দিকেই রয়েছে।" পরে এই নদী যেখানে পুবদিকে বেঁকেছে, সেখানে এসে তিনি বলেন— "মনে হয় বাস্তবতা যেন পুবদিকেই রয়েছে।" গত ত্রিশ বছর ধরে যে-বিজ্ঞানী বিজ্ঞানসাধনায় মগ্ন তাঁর পক্ষে একথা নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়— বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ স্রোতধারা কোনদিকে প্রবাহিত হবে বা কোন্‌দিকে গেলে বাস্তবতায় গিয়ে পৌঁছনো যাবে। আপন অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি জানেন, কেমন করে এই জ্ঞান-নদী অবিরত বিস্তৃততর হয়ে সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে; বহুবার নিরাশ হয়ে, প্রত্যেক বাঁকের মুখে এসে তিনি এ-চিন্তা ছেড়ে দিয়েছেন—"এই তো সামনে রয়েছে অনন্ত মহাসাগরের কল্লোল ও আভাস।" (Murmurs and scents of the Infinite Sea)।

এই সতর্কবাণী মনে রেখে একথা বলা হয়তো নিরাপদ যে গত কয়েক বছরের মধ্যে জ্ঞান-নদী অকস্মাৎ একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে। ত্রিশ বছর

আগেও ভেবেছি বা অনুমান করেছি যে এক যান্ত্রিক ধরনের চরম বাস্তবতার দিকেই আমরা এগিয়ে চলেছি। তার স্বরূপ হল—কতকগুলি অবিন্যস্ত পরমাণুর ভিড়, এক অজ্ঞাত বিধিলিপির নির্দেশে কতগুলি উদ্দেশ্যহীন শক্তির প্রভাবে, কিছুকাল নিরর্থক তাণ্ডব-নৃত্যে মেতে নিস্পন্দ হয়ে এক মৃতজগৎ সৃষ্টি করবে। এই পূর্ণযান্ত্রিক জগতে, সেই অন্ধশক্তির ক্রিয়ায়, এক অপঘাতে, আবির্ভাব ঘটেছে প্রাণলোকের। পরমাণু সম্বলিত এই বিশ্বের এক ক্ষুদ্র দেশমাত্রা, জানি না হয়তো বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দেশমাত্রা, এক ক্ষুদ্র কালমাত্রায় চেতনশীল হয়ে উঠেছে; কিন্তু অন্তিমে নিয়তির তাড়নায়, সেই অন্ধ যান্ত্রিক শক্তির আঘাতে, জমাট বেঁধে তার সমাধি ঘটবে। পড়ে থাকবে এক অসাড় নিস্পন্দ প্রাণহীন জগৎ।

বিজ্ঞানের প্রাকৃত তত্ত্বের দিক থেকে সবাই প্রায় একমত হয়ে আজ এ-বাণী ঘোষণা করছেন—জ্ঞানের স্রোত বয়ে চলেছে এক অযান্ত্রিক বাস্তবতার দিকে; বিরাট যন্ত্রের চেয়ে, এক বিরাট চিন্তার সঙ্গেই বিশ্বের বেশি সাদৃশ্য রয়েছে ব'লেই মনে হয়। জড়ের রাজ্যে মনের আবির্ভাবকে এখন আর আকস্মিক ও অনধিকার প্রবেশ ব'লে মনেই হয় না; বরং তাকে জড়রাজ্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে আমাদের স্বাগত অভিনন্দন জানানো কর্তব্য। এই মন আমাদের স্বতন্ত্র মন (individual mind) নয়; এ হল এক 'সর্বগত মন', যেখানে আমাদের স্বতন্ত্র-মনসৃষ্টিকারী পরমাণুর দল 'চিন্তারূপে' বিরাজমান।

অতি ব্যস্ততায় গোড়ার দিকে এই ধারণা করেছিলাম—"আমরা ভুল করে, পদে পদে প্রতিহত হয়ে, এমন এক বিশ্বে আশ্রয় নিয়েছি যা সক্রিয়ভাবে প্রাণের নিতান্ত পরিপন্থী বা সর্বতোভাবে তার প্রতি উদাসীন।" নূতন জ্ঞানের আলোকে এখন এ-ধারণা সংশোধন করে নিতে হবে। 'মন' ও 'বস্তুর' যে-দ্বৈত-ধারণা (dualism) এই কল্পিত পরিপন্থিতার মূলে, তা

এখন মিলিয়ে গেছে; বস্তুর প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে বা তাকে অবাস্তব প্রতিপন্ন করে, কিংবা মনকে বস্তুর ক্রিয়াপদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে, এই অন্তর্ধান ঘটেনি। এ ঘটেছে মনের সৃষ্টি ও অভিব্যক্তিতে বাস্তব-পদার্থের আত্মপরিণতির ফলে। দেখতে পাই, বিশ্বে ভর করে আছে একটা সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের শক্তি, যে-শক্তির সঙ্গে আমাদের স্বতন্ত্র মনের খানিকটা মিল রয়েছে; ভাবাবেগ, নীতি ও সৌন্দর্যবোধের স্থান সেখানে নেই, অন্তত আজও তার সন্ধান মেলেনি—কিন্তু রয়েছে এক চিন্তাধারার বেগ, যাকে বলতে হচ্ছে 'গাণিতিক,' এর চেয়ে ভালো শব্দসম্পদ নেই ব'লে। যদিও এই বিশ্বপ্রকৃতিতে অনেক কিছুই প্রাণের স্থূল আনুষঙ্গিকের পরিপন্থী ব'লে মনে হয়, অনেক কিছুই আবার প্রাণের মূল সক্রিয়তার অনুকূল ব'লে দেখি। প্রথমে যতটা ভেবেছিলাম, এখন দেখা যাচ্ছে বিশ্বে আমাদের আবির্ভাব, ততটা আগন্তুক বা অপরিচিতের অনধিকার-প্রবেশের কুণ্ঠার মতো নয়। আদি-পঙ্কে (primaeval slime) যে-সব জড়পরমাণু প্রথম প্রাণের আবেগে এক অপরিস্ফুট স্পন্দন নিয়ে জেগে উঠেছিল, তারা এই আপাত পরিপন্থিতাকে জয় করে বহুগুণিত হয়েই চলেছে; বিশ্বের মূলশক্তির সহায়তা না পেলে তারা মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা আজও অব্যাহত রাখতে পারত না।

তাই আজ অন্তত কিছু অনুমান করার একটা আবেগ এসেছে, কিন্তু কে জানে জ্ঞানের স্রোত আর কতবার প্রতিহত হয়ে আপন পথে ফিরে আসবে! একথা মনে রেখে, শুধু আর একটুখানি যোগ করে, এখানেই দাঁড়ি টানছি—"যা-কিছু বলা হয়েছে, যে-কোনো সিদ্ধান্তের অবতারণা করা হয়েছে, তা স্পষ্টই অনুমানলব্ধ ও অনিশ্চিত; হয়তো এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় তার ছাপ পড়েছে। কতকগুলি দুরূহ সমস্যা, যা মানুষের উপলব্ধি সীমার চিরবহির্ভূত ব'লে মনে হয় তাদের সম্বন্ধে আধুনিক

বিজ্ঞানের কোনো কিছু বলার আছে কিনা, তারই আলোচনার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি। একটা অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল আলোর রেখা ছাড়া আর কিছু সন্ধান পেয়েছি ব'লে দাবী করতে পারি না; হয়তো এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, কারণ কিছু একটা দেখার জন্যে দৃষ্টিশক্তিকে অত্যধিক পীড়িত করতে হয়েছে। তাই জোর করে বলতে পারি না, আধুনিক বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট একটা কিছু ঘোষণা করার আছে, বরং বলা যায় ঘোষণা করার প্রচেষ্টা থেকে বিজ্ঞানের নিবৃত্ত হওয়া উচিত: জ্ঞানের নদী প্রতিহত হয়ে বার বার ফিরে এসেছে আপনারই স্রোতপথে।"

****